পঞ্চম অধ্যায়

উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চেতনা

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার থিয়েটারে উৎপল দত্ত একটি ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী নাট্য ও থিয়েটার চর্চায় তাঁর প্রধান অভিনিবেশ ছিল রেভ্যুলিউশনারি (বিপ্লবী) থিয়েটার অভিযাত্রায়। শুরু থেকেই উৎপল দত্ত শোষিত, বঞ্চিত, মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে থিয়েটার সাধনার কেন্দ্রীভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঞ্চিত গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের অগ্রপথিকেরা তাঁর নাটকের মূল বিষয় ও প্রধান চরিত্র। কেবল নাট্যবিষয় নয়, নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর নাটকসমূহ বাংলা নাট্যভুবনে নতুন দিক নির্দেশ করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন— "নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা।"[১] এই বিশ্বাস উৎপল দত্তকে গণনাট্যের কেন্দ্রভূমিতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত, হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাংলা নাটককে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিচেতনার নিরিখে বিপ্লবী থিয়েটার চর্চার ধারার স্রোতে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলার থিয়েটারের ধারায় অর্থাৎ দৃশ্য, আলো, সংগীত, অভিনয়, নেপথ্য ধ্বনি, নাট্য প্রয়োগ, নাট্যরূপ সবদিক দিয়েই উৎপল দত্ত এক নব যুগের স্রষ্টা। তাঁর কালে তিনি একক ও স্বতন্ত্র।

উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাট্যকার, যিনি বাংলা নাটক ও থিয়েটারে মার্কসীয় চেতনায়, নাট্য রূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য গগনচুম্বী। অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার— তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি সফলতার চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার থিয়েটারের চারণ, আদি-অন্ত থিয়েটারওয়ালা। সুরজিৎ ঘোষকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, "আমি থিয়েটারের লোক, থিয়েটারেই থাকব। সারাজীবন থিয়েটার করব।"[২] কলেজে পড়াকালীন থিয়েটারের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও ভালোবাসা জন্মলাভ করেছিল, সেই ভালোবাসা আজীবন বজায় ছিল। নিবিড়ভাবে থিয়েটার চর্চার জন্য নিজেদের নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেছেন, কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার প্রযোজনাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন, থিয়েটারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভেবেছিলেন। থিয়েটারকেই মেনেছিলেন ধ্যান জ্ঞান। কেবল একজন শিল্প স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে থিয়েটার জগতে অবতীর্ণ হননি, নাটক অর্থাৎ থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। সে লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন আজীবন, সে লক্ষ্য আবেগ তাড়িত নয়, আদর্শ

দ্বারা সুনির্দিষ্ট। যে রাজনৈতিক ভাবধারায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, সেই বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। আর সেই বিশ্বাস তাঁর নাটক তথা থিয়েটারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। থিয়েটার নিয়ে তিনি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে, খেটে খাওয়া গণমানুষের কাছে, সাধারণ মানুষের আবেগের কাছে। থিয়েটার তথা নাটক দিয়ে শ্রমজীবী বঞ্চিত-শোষিত মানুষের আবেগকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং সেই অদম্য আবেগ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন সমাজ পুনর্গঠনে। ভাঙাচোরা জীর্ণ সমাজের মুক্তি ঘটিয়ে নতুন সমাজ গঠনের দায়বোধ থেকে নাট্যকার তথা থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্তের জন্ম।

একাধিক শিল্পের সমন্বয়ে থিয়েটার গড়ে ওঠে, তাই থিয়েটার কোন একটি অঙ্গ অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে পারে না। "থিয়েটার এমন একটা স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম যার মধ্যে দৃশ্য, আলো, সঙ্গীত, অভিনয়, নেপথ্য ধ্বনি একত্রীভূত।"[৩] অনেকসময় শক্তিশালী নাটক বিনষ্ট হয়ে যায় কিছু অযোগ্য পরিচালকের হাতে পড়ে। থিয়েটারে নাটক একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি থাকে না, প্রযোজনার তাগিদে বা প্রযোজনার পদ্ধতিতে তা শুষে নেওয়া হয়, প্রয়োজনে পরিবর্তন করাও হয়। নাটক পরিবর্তিত হয়ে যায় বা ভাষান্তরিত হয়ে যায় অভিনেতার মাধ্যমে, থিয়েটারি শিল্পের দেহে। অভিনেতার চেহারা, কণ্ঠস্বর, চলাফেরা, কথাবলার ভঙ্গি আমরা দেখি এক বিশেষ পরিবেশে, তার দৃশ্যগ্রাহ্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রং, আলো, পোশাক, সংগীত ইত্যাদির সাহায্যে। এসব সবকিছুই মিলেমিশে একাকার হয়ে নাটকের পাণ্ডুলিপির চেহারা বদলে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এই প্রযোজনা পদ্ধতির নানা কৌশলে যে নতুন জিনিস জন্ম নেয় সেটাই থিয়েটার। থিয়েটারে প্রত্যেক পরিচালক পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি ও তার নিজস্ব থিয়েটারী দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পগত প্রবণতা অনুযায়ী রীতিনীতির প্রবর্তক। একটি নাটক কীভাবে, কোন কলাকৌশলে দর্শকের সামনে গিয়ে পৌঁছবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে পরিচালকের ওপর এবং নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শিল্পবোধের ওপর। বিশেষত, নাট্যনির্দেশকের শিল্পাদর্শের ওপর। থিয়েটার তাই কেবলমাত্র নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্ভর নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রযোজনা নির্ভর। উৎপল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

থিয়েটারের একটা ভিস্যুয়াল দিক আছে যেটা বাদ দিয়ে থিয়েটার আর থিয়েটার থাকে না।[৪]

উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারে ধ্রুপদী রীতিনীতিকে অর্থাৎ ধ্রুপদী নাট্যাঙ্গিককে প্রত্যাখ্যান করেছেন। থিয়েটারে তথা নাট্য প্রয়োগে স্তানিস লাভস্কি, পিস্কাটার, ব্রেখট, ওখলপকভ-এর নাট্য পদ্ধতি উৎপল দত্তকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু রোমান ঐতিহ্য কিংবা ভিক্টোরিয় ও এলিজাবেথিয় এমনকি সংস্কৃত নাট্যপ্রকরণ, কোনটিরই সরাসরি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ তিনি মানেননি।

স্তানিস লাভস্কির কাছ থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা, দলগত অভিনয়, সত্যবাদিতা এবং মঞ্চে উদ্বেগমুক্ত শিথিল থাকার কৌশল শিখেছেন। উৎপল দত্ত মনে করতেন অভিনয় করার মধ্যে আবেগের কোনো স্থান নেই, অভিনেতাকে ঠাণ্ডা মাথায় দলগত অভিনয়ে শামিল হতে হয়—

> *আমার মনে হচ্ছে আবেগের স্থান অভিনয়ে নামমাত্র বা নেই! আর নেই বলেই নবনাট্য-আন্দোলন অভিনয় নিয়ে নূতন পরীক্ষার দিকে পা বাড়াতে সাহস করেছে। নূতন অভিনয়, দলগত অভিনয়। ঠাণ্ডা মাথায় নিরুত্তাপ চিত্তে মঞ্চে না নামলে দলের মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে যেখানে বৃহত্তর কম্‌পোজিশনে নিজের 'স্থান নেওয়ার প্রশ্ন সেখানে ওই আবেগই হচ্ছে এনিমি নাম্বার ওয়ান!* [৫]

স্বেচ্ছাচারী বড়ো অভিনেতাদের হাত থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করে অভিনয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন স্তানিসলাভস্কি। সেই উর্বর ক্ষেত্রে সততার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন। ব্রেখট-এর এপিক থিয়েটার ও স্তানিসলাভস্কির সৃষ্ট ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষত জগৎকে দ্বন্দ্বের ভিত্তির ওপর স্থাপন, ব্রেখট, স্তানিসলাভস্কির কাছ থেকে শিখেছিলেন। ব্রেখট নিজেও শ্রদ্ধা ভরে মস্কোর মনীষী স্তানিস লাভস্কির কাছ থেকে কী কী শিখেছেন, শ্রদ্ধাভরে তার তালিকা প্রস্তুত করে গেছেন—

> *নাটকের কাব্যগুণ উপলব্ধি করা...*
>
> *সমাজের প্রতি দায়িত্ব...*
>
> *দলগত অভিনয়...*
>
> *নাটকের কাহিনী বিন্যাস...*
>
> *সততা সহকারে চরিত্রের মুখোমুখি হওয়া...*
>
> *অনুভূতি ও কৌশলের ভারসাম্য...*
>
> *বাস্তবকে দ্বন্দ্বে ভরা রূপে উপস্থিত করা...*
>
> *মানুষের মহত্ত্ব।* [৬]

স্তানিসলাভস্কি বনাম ব্রেখট এই দ্বন্দ্ব অনেকেই উপস্থিত করেন, কিন্তু তারা অন্তরের যোগটা দেখতে পান না। কমিউনিস্ট হিসেবে ব্রেখট এগিয়ে আছেন অনেকটাই কিন্তু এটা ফর্মের প্রশ্ন, আঙ্গিকের প্রশ্ন। এখানে দু'জনেই দুই আলাদা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, দু'জনের কলা-কৌশলই অব্যর্থ। বিপ্লবী বিষয়বস্তু দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তীক্ষ্ণ হাতিয়ার। ব্রেখট যেখানে দর্শক গোষ্ঠীকে

সজাগ করেন, স্তানিস লাভস্কির পদ্ধতি সেখানে দর্শকদের টেনে নেয় 'দ্বন্দ্বে ভরা বাস্তবে'। এপিক থিয়েটার বুর্জোয়া সমাজকে বিচ্ছেদ করে যুক্তি তর্কের সাহায্যে মানুষকে কমিউনিস্ট করে তুলতে চায় আর বাস্তববাদী থিয়েটার আবেগ ও সমব্যথা জাগিয়ে মানুষকে করতে চায় বিদ্রোহী। এপিক স্বভাবতই অনেক পরিণত অনেক বড়ো অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। তবুও বিকল্প আঙ্গিক হিসেবে বাস্তববাদী ধারাও বহু বিপ্লবী বার্তার বাহন হয়ে বেঁচে আছে সারা বিশ্বে। প্রাচীন ও আধুনিক বিরাট নাট্য সাহিত্য রয়েছে, যা এপিকের কায়দা কানুন ছাড়া দর্শকের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না বা দর্শকের সহজ বোধ্য হয় না; কিন্তু তার পাশে রয়েছে অন্য বহু নাটক, যেগুলির প্রধান আশ্রয় একমাত্র এই বাস্তববাদী প্রয়োগধারা। তাই নাটককে যারা প্রচারের বাহন হিসাবে, সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে দেখেন তাদের কাছে এই দুই ধারার কোনো বিরোধ নেই। বরং তারা পরস্পরের পরিপূরক। উৎপল দত্ত এই দুই ধারা তথা স্তানিস লাভস্কি থিয়েটার পদ্ধতি ও ব্রেখটীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত।

ব্রেখটের নানা নাটকে নানা ফর্ম ব্যবহৃত, তিনি সর্বত্র একই এলিয়েনেশন বা একই এপিক পদ্ধতি ব্যবহার করেননি। তিনি এমন কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন যেখানে তাঁর বিখ্যাত এপিক পদ্ধতি ব্যবহার করেননি বরং হুবহু স্তানিসলাভস্কির পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। উৎপল দত্ত ব্রেখট সম্পর্কিত আলোচনায় এপিকের সার কথা প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

> *ফর্ম শূন্য থেকে মাদারি কা খেল মারফৎ ব্রেখ্‌ট্‌-এর ঘাড়ে গিয়ে ভর করেনি। ফর্মের উদ্ভব বিষয়বস্তু থেকে, নাট্যকারের চিন্তাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে। ব্রেখ্‌ট্‌-এর নানা নাটকে নানা ফর্ম ব্যবহৃত, সর্বত্র একই এলিয়েনেশন বা একই এপিক পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেননি। এমন নাটকও তিনি লিখে মঞ্চস্থ করেছেন যেখানে তিনি হুবহু স্তানিস লাভস্কি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন ('সেনোরা কারা'-র প্রযোজনা একটি উদাহরণ)। ফর্মের খোঁজে ব্রেখ্‌ট্‌ পিকিং অপেরার কাছে গেছেন, কাবুকি বুঝতে চেয়েছেন, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পড়েছেন, মার্ক্‌স্‌ অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর কাছে ফর্ম কোনো দিনই অনড় কোনো ফর্মুলা নয়। যেভাবে হোক সাত সমুদ্দুরের নানা পাড় থেকে যে কোনো রং জোগাড় করে হোক, বিষয়বস্তুটাকে পৌঁছে দিতে হবে দর্শকের মগজে, মিশিয়ে দিতে হবে দর্শকের চিন্তাধারায়।* [৭]

ব্রেখ্‌ট্‌ নিজেই একজন শুধু মার্কসবাদী নন, তাঁর মতে মার্কসবাদী না হলে প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার হওয়া যায় না। তিনি মনে করেন শ্রেণিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করলে অভিনেতা হওয়া যায় না। ব্রেখ্‌ট্‌ নিরপেক্ষ ছিলেন না, তিনি একজন বিপ্লবী নাট্যকার। প্রতি মুহূর্তে তিনি শ্রেণিসংগ্রামের প্রচারক ও ব্যাখ্যাকারী। ব্রেখ্‌ট্‌ ছিলেন বিপ্লবের চারণকবি— এটাই প্রধান কথা ও

মূল কথা। তাঁর যুগের কোনো বিপ্লবই তাঁর চোখ এড়ায়নি। প্যরিকমিউন ('ডী টাগে'), ১৯৫০ সালে রুশ বিপ্লবকে কেন্দ্র করে 'মা', স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে 'কারার', হিটলারের অভ্যুত্থান 'উই', চীনের বিপ্লব 'সমাধান' প্রভৃতি একের পর এক বিপ্লব তাঁর নাটকের পটভূমি হিসেবে এসেছে। ছুরির মতো তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি পৌঁছে গেছে পুঁজিবাদের সারাৎসারে এবং ধর্মপ্রাণ অহিংসবাদের শোচনীয় ব্যর্থতায়। নাটকের পর নাটকে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের স্বরূপ, প্রচারক, অস্ত্রের উপাসক। উৎপল দত্তের মতে—

দমন কর নয়তো দমিত হবে— মাঝে অন্য পথ নেই। [৮]

এটাই ব্রেখ্‌ট্-এর প্রধান পরিচয় ও মানসিকতা। তিনি বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের এক যোদ্ধা।

উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্-এর মতো নিজেও বিপ্লবের চারণ, তাঁর যুগের বিভিন্ন সংগ্রাম, আন্দোলন, বিদ্রোহ এমনকি অতীত দিনের বিপ্লব, বিদ্রোহের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চোখ এড়ায়নি। সমস্ত বিপ্লব বিদ্রোহকে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই-এর বার্তা দিয়েছেন। সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়, ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনি বেছে নিয়ে থিয়েটার করার, যাত্রা লেখার প্রয়াস উৎপলের প্রধান নাট্যাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় মূলত এ সূত্রেই। উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্-এর থিয়েটার ভাবনার অনুসারী ও নাট্য মঞ্চায়ন তথা নাট্য প্রয়োগে ব্রেখ্‌ট্ স্তানিস লাভস্কি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রেখ্‌ট্-এর সারা জীবনের বিপ্লব চিন্তা, নাট্যচিন্তা এবং আঙ্গিক চিন্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। একইভাবে উৎপল দত্তেরও বিপ্লব চিন্তা, নাট্যচিন্তা ও আঙ্গিকচিন্তা আন্তঃসম্পর্কিত। ব্রেখ্‌ট্-এর মতো উৎপল দত্ত নিজেও একজন বিপ্লবী নাট্যকার, আর বিপ্লবী নাট্যকার কখনও নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তিনি ব্রেখ্‌ট্-এর মতো প্রাপ্তি মুহূর্তে থিয়েটার ভাবনার প্রতি ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামের প্রচারক। তাই তিনি সদর্পে ঘোষণা করতে পারেন—

আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোন আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি 'প্রোপাগান্ডিস্ট'। এটাই আমার মূল পরিচয়। [৯]

উৎপল দত্তের থিয়েটার মার্কসবাদী নাট্যচিন্তার নতুন সম্প্রসারণ এবং নতুন সংযোজন মাত্র। উৎপল দত্ত তাঁর নাটককে নির্দিষ্ট কোনো ফর্মূলায় বাঁধেননি, কারণ তিনি মনে করেন—

ফর্মূলা হচ্ছে নাটকের অশনি সংকেত। [১০]

নাটকের আসল কথা হল বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ব্রেখ্‌ট্ শতাব্দীর মহৎতম নাট্যকার বলে উৎপল দত্ত মনে করেন। দর্শকের কাছে বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্রেখ্‌ট্

কখনোই ফর্ম অন্বেষণ করেননি, উৎপল দত্তও তেমনি। ফর্ম দেশ-কাল সাপেক্ষ, বিষয়বস্তু চিরন্তন। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ব্রেখ্‌ট্‌ বিপ্লবী নাটকের পতাকাবাহী।

উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাট্যচিন্তা, নাট্যপদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। থিয়েটারে ব্রেখ্‌ট্‌-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎপল দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি একই ধরনের, তবে তিনি ব্রেখ্‌ট্‌-এর মঞ্চধারণার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেন নি; বরং উৎপল দত্ত দৃশ্য সজ্জা এবং দৃশ্য উপকরণ ব্যবহারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন বলেই আমরা জেনেছি। তীব্র জাতীয়তাবোধ ও সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ উৎপল দত্ত মনে করেন—

ব্রেখটের আঙ্গিক তাঁর দেশ জার্মানির তথা মধ্য ইউরোপের বহুশত বছরের মানস গঠনে তৈরী। সে আঙ্গিককে এ দেশে আনলে— এ দেশের মানুষের মানস গঠনের সঙ্গে মিলবে না। তাছাড়া বিষয়বস্তুর মধ্যেও পরতে পরতে রয়েছে জার্মানির রাজনৈতিক ঘটনার সাম্প্রতিক ছবি। তাই ব্রেখটের নাটকের আঙ্গিক কিংবা বিষয় পুরোপুরি ভারতবর্ষ তথা বাংলার থিয়েটার আঙ্গিকে ব্যবহার সম্ভব নয়। সম্ভব হল, ব্রেখটের ভাবনাটাকে নিয়ে আসা। ব্রেখটের Epic Theatre ও Alienation Theory অনেকসময় আমাদের ঐতিহ্যের সহায়ক হয় না। [১১]

উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্‌-এর মার্কসবাদী থিয়েটার ভাবনা বা নাট্যচর্চাকে মেনেছেন, তার নিপুণভাবে ব্যাখ্যাও করেছেন। কিন্তু কখনোই ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাট্য পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তাই ব্রেখ্‌ট্‌ যখন বলেন থিয়েটারে ‘এমপ্যাথির’ জায়গা নেই সেকথা উৎপল দত্ত মানেন না। যখন ব্রেখ্‌ট্‌ বলেন—

Theatre must provoke with its representations of human social life— উৎপল দত্ত একথা সহজেই স্বীকার করে নেন। কিন্তু তারপরেই ব্রেখ্‌ট্‌ যখন বলেন— It must amaze to public and this can be achieved by a technique of alienating the familiam— তখন উৎপল দত্ত তা অনুসরণ করেন না। [১২]

ব্রেখ্‌ট্‌ ও উৎপল দত্ত দুজনেই মার্কসবাদী ভাবনায় উদ্দীপিত ও জারিত থিয়েটারওয়ালা ও নাট্যকার। উৎপল দত্তের অনেক নাটকেই থিয়েটার ভাবনা, চরিত্র বা কোনো বিষয়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মার্কসীয় আদর্শে সম্পৃক্ত ব্রেখ্‌ট্‌ বিশ্বাস করেন—

Without Marxist knowledge and a socialist outlook, it is impossible to day to understand reality or to use one’s understanding to change it। [১৩]

মার্কসবাদী ভাবনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ উৎপল দত্ত একথাও বিশ্বাস করতেন এবং মার্কসবাদী ভাবনার নিরিখে তাঁরও সদর্প ঘোষণা—

I am partisan, no neutral and I believe in political struggle the day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too। [১৪]

পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্তের থিয়েটার সম্বন্ধে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, কী নাটকে, নাটকের বিষয়বস্তু বা প্রয়োগ পদ্ধতিতে— সব বিষয়ে তিনি প্রচলিত বাংলার থিয়েটারের যে রীতি বা প্রথা সে প্রথা ভেঙেছেন এবং বিশ্বের রাজনৈতিক থিয়েটারের মূলস্রোতের সঙ্গে তাঁর থিয়েটারকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসব কাজ করতে গিয়ে তাঁর কখনও গণমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়নি বা নিজের দর্শকদের কথায় বিস্মৃত হননি বরং তার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুই গণমানুষের কথা ভেবে বা দর্শকের কোষ্ঠীপাথরে যাচাই করতে চেয়েছেন। পরিচালক উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারের শৈলী ও অভিনেতার সঠিক অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন অনুভব করেন পারিপার্শ্বিক ও সমাজের অন্তরঙ্গ মেলবন্ধনে। কোনো অপরিবর্তনীয় তথ্য কিংবা দুর্বোধ্য তাত্ত্বিক ঘোরটোপে থিয়েটারকে আবদ্ধ করতে চাননি। পরিচালক উৎপল দত্ত থিয়েটারের সৌন্দর্যের পূজারি হতে গিয়ে জীবন প্রেমিক হতে ভুলে জাননি, গণমানুষের সম্পর্কে ছেদ হননি, বা নিজের দর্শকের কথা বিস্মৃত হননি বরং তাঁর সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবকিছুই গণমানুষের কথা ভেবেই বা দর্শকের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চেয়েছেন। পরিচালক উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারের শৈলী ও অভিনেতার সঠিক অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন অনুভব করেন পারিপার্শ্বিক ও সমাজের অন্তরঙ্গ মেলবন্ধন। কোনো অপরিবর্তনীয় তথ্য কিংবা দুর্বোধ্য তাত্ত্বিক ঘেরাটোপে থিয়েটারকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। পরিচালক উৎপল দত্ত থিয়েটারের সৌন্দর্যের পূজারি হতে গিয়ে জীবনপ্রেমিক হতে ভুলে যাননি, গণমানুষের সম্পর্ক ছেদ করেননি। তাই তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে মঞ্চের ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের বৃহৎ শক্তির যোগসূত্র স্থাপনের জন্য আজীবন সংগ্রামশীল ছিলেন। উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারে প্রযোজনার ক্ষেত্রে, মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচনে। বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তিনি দ্রুত তাঁর নাটকের জনগণ ও দর্শকের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত গণমানুষ ও দর্শককে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

প্রতি জাতি নিজ নিজ প্রিয় ফর্ম সৃষ্টি করেছে বহু শতাব্দী ধরে। সেই ফর্মেই সে দেখতে চাইবে বৈপ্লবিক নাটক। জাপানিদের কাছে বিপ্লবের বার্তা হয়তো কাবুকি মারফত সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যাবে, বাংলার মানুষের কাছে যাত্রায়, আর দক্ষিণ ভারতে নৃত্য মারফত, মহারাষ্ট্রে তামাশায়, উত্তর প্রদেশে নৌটংকিতে, গুজরাটে ভাওয়াইয়ে। আসল কথা বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। [১৫]

উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যজগতের ব্রেখ্‌ট্ ও পিস্‌কাটর। তিনি নাট্যকার হিসেবে ব্রেখ্‌ট্রের

মতো তথ্য-আদর্শ-নিষ্ঠাবান একজন নাট্যকার ছিলেন আবার বিখ্যাত পরিচালক পিসকাট্রের মতো দুর্ধর্ষ পরিচালক প্রযোজক ছিলেন। সেই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতের এক মহান অভিনেতা উৎপল দত্ত, যিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সদাসর্বদা যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন ও তাঁর শিল্পকর্মে বামপন্থী আদর্শ ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। উৎপল দত্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাহিত্যবিদ পবিত্র সরকার বলেছেন—

> *উৎপল দত্ত একই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতের ব্রেখ্‌ট্ এবং পিস্‌কাটর।... উৎপল দত্ত ছিলেন ব্রেখ্‌টের মতো এক তত্ত্ব ও আদর্শনিষ্ঠ নাট্যকার এবং পিস্‌কাটরের মতো এক দুর্ধর্ষ পরিচালক-প্রযোজক। ... এবং বাংলা নাট্যজগতের এক মহাপরাক্রান্ত অভিনেতা উৎপল দত্ত।* [১৬]

উৎপল দত্ত নাট্যকার হিসেবে নাটক রচনা করতে গিয়ে কখনও ভুলে যাননি যে, বিষয়বস্তু চিরন্তন ফর্ম দেশ-কাল সাপেক্ষ। তাই তিনি সচেতনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন এবং পরিচালক হিসেবে সেই বিষয়বস্তুর মঞ্চে উপস্থাপনার বিষয়ে যথেষ্ট খেয়াল রেখেছেন। কোন কৌশলে, কেমন মঞ্চে, কেমন আলো বা কেমন সংগীতের ব্যবহারে তিনি দর্শকের কাছাকাছি পৌঁছবেন তা সদাসর্বদা তিনি খেয়াল রেখেছেন। উৎপল দত্তের মতে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু বা বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সবকিছুই করতে হবে। উৎপল দত্ত সদাসর্বদা তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন যে ধরনের নাটকই উপস্থাপন করা হোক না কেন, তার মোড়কে রাখতে হবে বিষয়বস্তু ও সংগ্রামকে। আঙ্গিকের প্রশ্নকে যেহেতু নির্ধারণ করে বিষয়বস্তু, সেহেতু বিষয়বস্তুকে বোঝাবার জন্য যা যা করার প্রয়োজন তা করার জন্য উৎপল দত্ত নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, প্রতিটি নাটককেই তার নিজস্ব আঙ্গিক খুঁজে নিতে হবে এবং আঙ্গিক এমন অনড় কোনো পদ্ধতি নয় যে তাকে বদলানো যাবে না। বিষয়বস্তু দর্শকের হৃদয়গ্রাহ্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং দর্শকের চিন্তার সঙ্গে মেলাতে হলে, যে আঙ্গিক ব্যবহার সবচেয়ে কার্যকরী ও পরিস্থিতি সাপেক্ষ তা খুঁজে নেওয়াই একজন আদর্শ ও প্রকৃত নাট্যকারের কাজ। বাংলা নাটকে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয়েরই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎপল দত্ত সংযোজন করেছেন নতুন মাত্রা, নতুন দিক নির্দেশ করেছেন। দেশের গণমানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে যে নাট্যভিনয়, নাট্যআঙ্গিক বা যে নাট্যভাষায় বা যে নাট্য কৌশলে, উৎপল তাকেই যথার্থ নাট্যআঙ্গিক বলে মেনেছেন। প্রতি মুহূর্তে দর্শকের কষ্ঠিপাথরে তাঁর কার্যকারিতা যাচাই হবে। তাই নাটকটিকে মঞ্চোপযোগী হতে হবে, দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় হতে হবে। এ ব্যাপারে পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্তের বক্তব্য—

> *নাটকটিকে এমন বাঁধুনি, এমন গতি, এমন চমক দিতে হবে যেন দর্শকের ভালো লাগে, বিষয়বস্তু যেন এমন রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে আসে, এমন আঙ্গিক নিয়ে মঞ্চে ওঠে যেন দর্শক বুঝতে পারে ও খুশি হয়।* [১৭]

পরিচালক থিয়েটারের নিয়মে নিগড়ে বাঁধা। এতকাল বাংলা নাট্যশালা অভিনেতাদের লীলাক্ষেত্র ছিল, অভিনেতাদের আস্ফালনের আখড়া ছিল। অন্যের লেখা মুখস্থ করে, অন্যের সৃষ্ট দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে অভিনেতার নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ এমন আশ্চর্য এক আবহাওয়া গড়ে ওঠে যে থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। থিয়েটার বক্তার আসর নয় বা আবৃত্তির। নাটকটিকে পরিচালক থিয়েটারের ব্যাকরণ মেনেই দর্শকের সামনে উপস্থিত করেন। থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *থিয়েটারে আছেন অভিনেতা। তিনি কথা বলেন, চলা ফেরা করেন, হাত-পা নাড়েন। তবে কি তিনিই মূল গায়েন? তাঁর বাচিক অভিনয়ই যদি থিয়েটারের প্রধান উপকরণ হয়, তবে থিয়েটার আর আবৃত্তির পার্থক্য থাকে কি? যদি অভিনেতার অঙ্গ সঞ্চালনই মূল হয়, তবে নৃত্যবিদ হেসে বলবেন— আমার শিল্পরই বটতলা সংস্করণ হল থিয়েটার।* [১৮]

থিয়েটারের মধ্যে অভিনয়, দৃশ্য, আলো, সংগীত, ধ্বনি সবই একত্রীভূত। থিয়েটারে দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে চিত্রকলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এমনকি ভাস্কর্যও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। দৃশ্যসজ্জা দর্শকের সামনে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন যথাযথ আলোক সম্পাতের। সর্বোপরি প্রয়োজন সংগীতের। থিয়েটারে সংগীতের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু সংগীতের ব্যবহার স্বাধীন নয়। মুক্ত উচ্ছাস এক্ষেত্রে উপযোগী নয়। নাটকের প্রয়োজনেই সংগীত ব্যবহৃত হবে কিন্তু সংগীত ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে অর্থাৎ থিয়েটার বারোয়ারি শিল্পের সমন্বয়, থিয়েটার নানা শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তাই থিয়েটার থিয়েটারের ভাষায় কথা বলবে এবং সে ভাষার বর্ণমালা হল তার অভিনয়, দৃশ্য সজ্জা, সংগীত, আলোকসম্পাত প্রভৃতি। এসবের সমন্বয়ে থিয়েটার গড়ে ওঠে। এপ্রসঙ্গে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *থিয়েটার নানা শিল্পের মিলিত সৃষ্টি, আর এই মিলের ভিত্তি হল পরস্পরের সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ।*
>
> *আর এ থিয়োরির শত্রু হলেন বাস্তববাদীরা, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফপন্থীরা। এঁরা ভুলে যান শিল্প ঠিক জীবন নয়, শিল্প জীবনোর্ধ্ব, কালোর্ধ্ব, দেশোর্ধ্ব একটা কিছু। জীবন প্রবহমান; থিয়েটার স্থিতু। জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত। এই খণ্ডিতের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেহারাটা ধরতে গেলেই খণ্ডচিত্রকে একটা বাস্তবোত্তর রূপ দিতে হবে। রঙে ছন্দে বাঁধতে হবে তাকে। নইলে সে হয়ে থাকবে একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অসংলগ্ন চিত্র।* [১৯]

থিয়েটারে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অভিনেতাকে বেশি পরিমাণে গুরুত্ব প্রদানের ফলে

থিয়েটারে অন্যান্য উপাদানগুলি চরম অবহেলিত হয়েছে। অভিনেতাদের অত্যাচারে মঞ্চে তখন নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম, মঞ্চে অভিনেতার প্রভাব একক ও অটুট। যার ফলে থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। এ প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের মন্তব্য—

> *অভিনেতারা মঞ্চ দখল করেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জাকে উপেক্ষিত, অবহেলিত, দুয়োরানীর মতন পড়ে থাকতে হত পেছনে। অথচ আঙ্গিকের বিকাশে কোনো সুয়ো-র চেয়ে দুয়োরানীর অধিকারের কম হবার কথা নয়। কিন্তু সে-অধিকার স্বীকৃত হয়নি।... মঞ্চসজ্জাতেও তখন ন্যাকড়ায়-আঁকা বনপথ আর কক্ষ আর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থেকে ওই অভিনেতাদের প্রতিভার আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার, এখনো পর্যন্তও একক অভিনেতাদের অসংযত আস্ফালন চলছে।... অভিনেতার গগনস্পর্শী দম্ভের পায়ে তাদের চূরমার হতে হয়েছে। অভিনেতাকে মঞ্চটা ছেড়ে দিয়ে এরা সবাই ভিড় করেছে পেছনের দিকে, ধুকপুক করে কোনোমতে বাঁচবার জন্য।* [২০]

আধুনিক থিয়েটারকে পরিচালকের থিয়েটার বলা হয়। উৎপল দত্ত ‘চায়ের ধোঁয়া’ গ্রন্থে পরিচালকের জয়কে আঙ্গিকের জয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ আঙ্গিকই হল একজন পরিচালকের আত্মপ্রকাশের প্রধান ভাষা। এতদিন নাট্যআঙ্গিকের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না, নাট্যআঙ্গিক শৈশব অবস্থায় ছিল, কারণ এতদিন থিয়েটার ছিল অভিনেতাদের দখলে, অভিনেতাদের দাপটে নাট্যআঙ্গিকের গুরুত্ব অনেকটাই কম হয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত পরিচালক বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌ বলেছেন—

> *The theatre is not the servant of the dramatist, but of society।* [২১]

ব্রেখ্‌ট্‌-এর এই উক্তি বর্তমান পরিচালকদের যেন জগৎ কাঁপানো রণহুঙ্কার। তাই একজন পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্ত কি করণীয় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন—

> *থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস্‌, বর্ডার প্রভৃতি। তারপর হটাব সীন-জাতীয় যত জিনিস! মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব, এলোমেলো এদিক ওদিকে সিঁড়ি সাজাব। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেঝে আর ব্যাটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করব। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করব ক্রেগ-এর আঁকা রেখা কাটা একটা কালো পর্দা বা ব্রেখ্‌ট্‌-বর্ণিত বিদ্যুৎ আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করব নীল পোশাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শঙ্করের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়ব। বৃষ্টি বোঝাতে গুটিদশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াব ভীম বেগে। মাতালের চোখে*

কলকাতা দেখাব : কার্ডবোর্ডের মনুমেন্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা—। যাক্, করব অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব তা থিয়েটারি ঢং-এই করব। চিত্রপটের খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করব না। [২২]

উৎপল দত্ত নাটক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সেন্ট জেভিয়ার্সের কলেজ জীবন থেকে। কলেজ জীবন থেকে নাট্য প্রযোজনা শুরু করলেন, তখন থেকেই তিনি রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই উৎপল দত্তের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা অঙ্কুর হয়েছিল। সেই রাজনৈতিক বোধ, সেই রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, সচেতনভাবেই তিনি নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'দি্য অ্যামেচার শেক্স্পিয়ারিয়ান্স্' যখন নাটকটি মঞ্চস্থ করল, তখনই বোঝা গিয়েছিল পরিচালক উৎপল দত্ত শুধু আধুনিক থিয়েটারের কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত তাই নন, তিনি আধুনিক যুগের রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। প্রাচীন রোমের পটভূমিকায় শেকসপিয়রের নাটক 'জুলিয়াস সিজার'-কে উৎপল দত্ত মঞ্চস্থ করলেন আধুনিক সাজসজ্জায়, একেবারে একালের মিলেটারি পোশাকে। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে যা ছিল প্রাচীন রোমের স্বৈরতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীদের মধ্যে লড়াই, উৎপল দত্ত তাকেই রূপান্তরিত করলেন একালের ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের লড়াই হিসেবে। নাটকে সীজার মঞ্চে আসেন ফ্যাসিস্ট উর্দিতে, সমবেত সেনেটররা লাল ও কালো পোশাক পরে তাকে 'হাইল' উচ্চারণে স্বাগত জানান। সোস্যালিস্ট ব্রুটাশ রক্তপাতের মুখোমুখি হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হন আর কমিউনিস্ট ক্যাসিয়াস তাকে রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোঝান। প্রাচীন রোমের পটভূমিকে উৎপল দত্ত সুকৌশলে একালের পটভূমিতে পরিণত করেছেন। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের স্মৃতিচারণায় উৎপল দত্ত জানিয়েছেন—

সিজারের মধ্যে যেন কালোর্ধ দেশোর্ধ এক ডিক্টেটর দেখতে পেয়েছিলেন মহাকবি। আমাদের সিজার (এলিস এব্রাহাম) ফেল্ট হ্যাট মাথায় যখন ভাষণ দিতে উঠলেন, সমবেত কালো ও লাল পোষাকে সজ্জিত সেনেটরগণ যখন প্রবল 'হেইল' উচ্চারণে হাত তুলে সেলাম করলেন, যখন প্রজতন্ত্রী ব্রুটাস (আমি) রক্তপাতের মুখোমুখি হয়ে দ্যোদুল্যমান, যখন উগ্রপন্থী ক্যাসিয়াস (প্রতাপ) নির্ভুলভাবে রক্তাক্ত সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা বোঝান, যখন নির্মম কুচক্রী এ্যান্টনি (জেফ্রি আইজাক) যে কোন মহাবাগ্মী ফ্যাসিস্তের মতন জনতাকে বিপথে চালিত করেন, তখন নাটক হঠাৎ হয়ে উঠেছিল সমকালীন বিশ্বের এক দর্পণ। ব্রুটাস ও এন্টনির ফোরাম বক্তৃতা দুটি আমরা উপস্থিত করেছিলাম রেডিও ভাষণ হিসেবে। শেষ ফিলিপাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম বোমা-বিধ্বস্ত এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ, যেখানে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়েছে। ঘন ঘন মেশিনগান ও উড়ন্ত বোমারু বিমানের আবহ-শব্দের সঙ্গে চলেছিল শেষ অঙ্কের অভিনয়। [২৩]

এই পর্বে উৎপল দত্ত একনিষ্ঠভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেছিলেন। তেমনি 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এ একাধিক সদস্য এসেছিলেন যারা রাজনৈতিকভাবে বামপন্থী ছিলেন। সকলের পরামর্শ মেনে এইসময় দু'টি রাজনৈতিক নাটক— ক্লিফর্ড ওডেট্স-এর 'ওয়েটিং ফর লেফটি' এবং 'Till the day, I did' প্রযোজনা করেন। বিপ্লবী এই দু'টি নাটকের মধ্যে উৎপল দত্ত সচেতনভাবে এদেশীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। এইসময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হওয়া, কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে নানারকম গ্রেপ্তার, অত্যাচার, নির্যাতন, বেপরোয়া গুণ্ডামি প্রভৃতির ফলে পার্টির নেতাকর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাদের হৃত মনোবল ও সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য উৎপল দত্ত সুকৌশলে তাদের জোটবদ্ধ ও একত্রিত করার উদ্দেশ্যে নাটক দুটি প্রযোজনা করেন। নাটক দুটি প্রযোজনার কারণ হিসেবে উৎপল দত্ত বলেন—

> *১৯৪৮ সাল কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হল। গ্রেপ্তার, নির্যাতন চলল বেপরোয়া। ... কারাগারে গুলিচালনার সংবাদে ক্রোধ যেন ব্যর্থ নিঃশ্বাস হয়ে ধাক্কা মারছিল বক্ষপঞ্জরে। কাকদ্বীপে নারীহত্যা, নয়ানপুরের মাটি লাল, ডিব্রুগড়ে গণনাট্যের গুলিবর্ষণ, ময়দানে-হাজরা পার্কে জন-সমাবেশে বেপরোয়া গুলিচালনা, বউবাজারে নারী মিছিলের ওপর গুলি— আর লিটল থিয়েটার কিসের তপস্যায় মৌনী? অতএব ধরা হল ক্লিফর্ড ওডেট্স্-এর বিপ্লবী নাটক 'ওয়েটিং ফর লেফটি'।* [২৪]

বিপ্লবী নাকট 'ওয়েটিং ফর লেফটি' প্রযোজনায় এক এবং অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট পার্টির হৃত মনোবলকে পুনঃরুদ্ধার করা ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা। এর পরের নাটক তিনি প্রযোজনা করেন ক্লিফর্ড ওডেট্স-এর "Till the day I die"। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে তৈরি 'Till the day I die'। জার্মান পার্টির বীরত্ব গাথা আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হয়েছে, যা ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা তথা ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাহিনি হয়ে উঠেছিল।

উৎপল দত্তের মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও মার্কসবাদী আদর্শকে স্মরণে রেখে তাঁর কিছু বিখ্যাত সফল প্রযোজনা সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে— বিহারের ধানবাদ অঞ্চলে তখন সদ্য ঘটে যাওয়া জামাডোবায় চিনাকুড়ি ও বরাধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখলেন 'অঙ্গার' নাটক। খনি শ্রমিকদের সে মর্মান্তিক অবস্থার সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রের শিরোনামে। উৎপল দত্ত তাঁর নাট্য প্রযোজনার সহায়ক কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে গেলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, কথা বললেন খাদনের শ্রমিকদের সঙ্গে। খনি শ্রমিকদের জীবন ও তাদের অর্থনৈতিক শোষণের নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি অনুধাবন করলেন। দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক খনি গহ্বর থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছিল, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সবকিছু দেখে শুনে বুঝে কলকাতায় তাঁরা ফিরে এলেন এবং লিখলেন কালজয়ী নাটক 'অঙ্গার'। প্রথমে এর নাম রাখা

হয়েছিল ‘কালো হীরে’, পরে লিট্‌ল্ গ্রুপ থিয়েটারের তদানীন্তন সভাপতি চিত্ত চৌধুরীর মতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘অঙ্গার’। খনি শ্রমিকদের জীবনের কথা তাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা, শোষণ-বঞ্চনার কথা, শ্রমিকদের সংগ্রামের কথা— এইসব নিয়েই বিহারের কালো মাটির কান্না ‘অঙ্গার’ নাটকের মধ্যে ধূমায়িত হল। কালো কালো মানুষগুলির প্রাণবন্ত অভিনয়, উৎপল দত্তের নাট্য রচনা ও পরিচালনা, পণ্ডিত রবিশংকরের সুর মূর্ছনা, তাপস সেনের আলোর কারিকুরি, নির্মল গুহরায়ের মঞ্চসজ্জার অসাধারণ দক্ষতা, সর্বোপরি সবার মিলিত কর্মকাণ্ডে এবং অভিনয়ের প্রাণস্পর্শে বাংলার থিয়েটারে এক প্রাণোন্মাদনার জোয়ার নিয়ে এসেছিল।

বাংলার থিয়েটারের এই অভাবিত সন্ধান এবং উপস্থাপনার আন্তরিক নৈপুণ্য এবং উৎপল দত্তের প্রযোজনার বিশেষ ভঙ্গি ও কৌশল সবাইকে আকর্ষিত ও মুগ্ধ করল। অভিনয়ে সবাই জীবন্ত হয়ে উঠলেন, বিশেষ করে শট্ ফায়ারার স্বপ্ন বিলাসী বিনুর ভূমিকায় শ্যামল সেন অনবদ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখলেন এবং সনাতনরূপী রবি ঘোষ সবার অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। বিনুর মা রূপী শোভা সেনের প্রাণবন্ত ও সজীব অভিনয় বিশেষ ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়। বিশেষত চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে শট্ ফায়ারার বিনু চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে অতিবাহিত করা একটা নিম্নপরিবারের সংসারের করুণ কাহিনি, যা বিনু ও তার মায়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে আসে তা দেখে দর্শক মোহিত হয়ে যান ও তাদের প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শককে অশ্রুসিক্ত করে তোলে—

বিনু : তুমি বুঝতে পারছ না মা, পরে বুঝবে আমি ঠিকই করেছি।

মা : না, আমি তো বুঝব না! দিনের পর দিন একা রাঁধুনির কাজ, ঝিয়ের কাজ করে চলেছি কবে তুই দুটো খেতে দিবি সেই আশায়। ঘর বেঁধে দিবি পাহাড়ের কাছে, বাগান করবি, তুলসীতলায় প্রদীপ দেবো, সুমি শাঁখ বাজাবে। কত কথাই না বলেছিলি। আর আজ সে সবই এল তোর কাছে, তুই ছুঁড়ে ফেলে দিলি। একবার ভাবলি না—। ... সুমির বিয়ে দিবি বলেছিলি না? তিন মাইল যেতে তিন মাইল আসতে— হেঁটে হেঁটেই মরে যাবে মেয়েটা।

বিনু : (একমুখ ভাত নিয়ে একটু হেসে) মা, এখন নয়, একটু খেয়ে নিই।

[মা চুপ করে থাকেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়— তাঁর চোখ ফেটে জল আসে। আঁচলে চোখ মোছেন।]

মা : ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সব প্রতিজ্ঞাই তো ভুলেছিস। আর কেন? এবার আমাদের বার করে দে— মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষে করে পেট চালাই।

বিনু : শোনো মা, কেন অমন করে বলছ? আমি যা করেছি কর্তব্য বলেই করেছি। ও করতে আমি বাধ্য।

মা : তোর কর্তব্য তোর মা'র প্রতি প্রথম। নিজের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, বনের মোষ তাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিনু : আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্তত বুঝবে।

মা : না, বুঝব না, বুঝতে চাই না। গত দেড় মাস এক বেলা খাচ্ছি। পেট ভরে শেষ কবে খেয়েছিলাম মনেই নেই। এ অবস্থায় কি করে বুঝব?

বিনু : আমি চেষ্টা তো কম করিনি, মা।

মা : কবে চেষ্টা করেছিস? যা পেয়েছিলি নিজে শখ করে খোয়াতে বসেছিস।

বিনু : শখ করে নয়, বাধ্য হয়ে। [২৫]

সারা মঞ্চ জুড়ে এতগুলো চরিত্রের একসঙ্গে প্রাণবন্ত, সচল, সুন্দর অভিনয় দর্শককে বিহ্বল করে তোলে। সনাতন রূপী রবি ঘোষকে দেখতে পাই যখন খনি গহ্বরে শ্রমিকের দল বেরোতে না পারায় দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন সনাতন তাদেরকে আশ্বস্ত করতে থাকে ও সঠিক পথ নির্দেশ করতে প্রয়াসী হয়। আটকে পড়া সমস্ত শ্রমিককে মানসিকভাবে আশ্বস্ত করতে থাকে ও বিপদের মাঝখানে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে—

সনা : চুপ। কেউ আর একটা কথা বলবে না। মরতে হয় মরব। তা বলে পাগল হয়ে ভুল বকতে বকতে মরব কেন? [২৬]

কয়লার খনির গহ্বরে যখন জল প্রবেশ করে এবং একের পর এক শ্রমিক জলের অতল গহ্বরে ডুবতে থাকে, বিনু ও সনাতন— তাদের মৃত্যুও আসন্ন, তখন ডুবে যেতে যেতে তাদের বেদনাভরা মর্মস্পর্শী সংলাপ ও অভিনয় দর্শকের অন্তরকে নাড়া দিতে সক্ষম হয় ও অন্তর বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে—

সনা : উপরের লোককে জানাবে না কি করে আমরা ফুরিয়ে গেলাম?...

বিনুর কণ্ঠস্বর : শ্রীচরণেষু, মা, কি লিখি। কি করে তোমাকে বোঝাই— এবার আর জমি কেনা হোলো না; সন্ধ্যাবেলায় তোমার তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়াও হয়ে উঠলো না। তোমার বুক ভেঙে যাবে জানি মাগো, তবু আমায় ক্ষমা কোরো, এর বেশি এবার করতে পারলাম না। তোমার মুখখানা

একবার যদি দেখতে পেতাম! সুমিকে ভালোবাসা দিও...

সনাতনের কণ্ঠ : পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের ভুলো না। মানুষের ঐশ্বর্য আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবন রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই— [জলের ভীম গর্জনে প্রায় চাপা পড়ে যায় কণ্ঠ, তবু দ্রুত লিখে যায় সনাতন—।]

ঐশ্বর্য লিপ্সাই মানুষকে করে তোলে শয়তান আর সেই শয়তানরা হাসিমুখে আমাদের জলে ডুবিয়ে মারে। আমরা মরে যাই, ক্ষতি নেই, তোমরা দেখো এর পরে যেন আর একজন মানুষও এভাবে ইঁদুরের মতন না মরে।...

বিনু : মা! আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, মা!... আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম— ... আর কিছু চাইনি আমি— শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম— [২৭]

বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে 'অঙ্গার' নাটকের দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চব্যবস্থা দর্শককে অভিভূত করল। একটি কয়লাখনির পুরো পিট হেড লিফট সমেত মঞ্চে তৈরি করা হয়েছিল অভিনয়ের সুবিধার্থে। পরে দেখা যায় সেই পিট হোল দিয়ে জল ঢুকছে খনির মধ্যে যা দেখে দর্শক চমকিত হল। তাপস সেনের আলোর বাহাদুরিতে দর্শক দেখল কয়লাখনির ভিতর জল ঢুকছে, জলের স্তর ক্রমাগত বাড়ছে এবং কয়লা খাদানের মধ্যে আটকে পড়া খনিশ্রমিকেরা আস্তে আস্তে জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় তলিয়ে যেতে যেতে তাদের যে আর্তনাদ, হাহাকার, প্রাণান্তকর মর্মস্পর্শী দমবন্ধ করা সেই দৃশ্য থিয়েটারকে এক নয়া মাত্রায় উন্নীত করতে সক্ষম হল। চতুর্থ দৃশ্যে রেসকিউ কর্মকাণ্ডে অপূর্ব আলোকসম্পাত এবং শেষ দৃশ্যে একই সঙ্গে ভয়াবহ ও মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টিতে আশ্চর্য পরীক্ষা চালানোর জন্য তাপস সেন প্রশংসিত হয়েছিলেন। খনি গহ্বরে জল প্রবেশ ও জলস্তর বাড়া সেই জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খনিশ্রমিকদের ডুবে যাওয়ার দৃশ্য তাপস সেন অপূর্ব আলোকসম্পাতের কায়দা কানুনের দ্বারা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সমালোচকরা 'অঙ্গার'-এর এই জলের দৃশ্যকে নিয়ে যখন সমালোচনা করেন, তার প্রত্যুত্তরে উৎপল দত্ত জানান—

কাহিনীর একান্ত প্রয়োজনেই আসছে জল। প্রথম থেকেই ইঙ্গিত রয়েছে মৃত্যুর— কয়লাখনি মজুরের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি, যার হাত থেকে মুক্তি নেই। পুরো নাটক নির্মমভাবে এগুচ্ছে ওই শোচনীয় মৃত্যুর দিকে। বিনুর ছিল স্বপ্ন, ছিল আশা— ওই মৃত্যুতে তার স্বপ্নভঙ্গ। মা তাঁকে কোন এক মুহূর্তে অপমান করেছিলেন— ওই মৃত্যুতে তার অবসান। মহাবীর সিং-এর ছিল মানুষের প্রতি গভীর অবজ্ঞা— ওই মৃত্যুতে তার আত্মোপলব্ধি। মুস্তাকের ছিল সবাইকে ঘোল খাওয়াবার ক্ষমতা— ওই মৃত্যুতে তার

নিজেরই ঘোল খাওয়া। সনাতনের ছিল জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াবার অভিযান— ওই মৃত্যুতে তার জীবনলাভ। এমনি সবাই— সব চরিত্র। ওই মৃত্যুই একাধারে ক্লাইম্যাক্স, সলিউশন, পরিণতি, নাটকে বক্তব্যের সম্পূর্ণতা— সেই মৃত্যুকেই বহন করে আনছে জলোচ্ছ্বাস। তাই জলোচ্ছ্বাস আসছে নাটকের প্রয়োজনে। [২৮]

নাটকের শেষ দৃশ্যসজ্জার সৃষ্টি করেছিলেন নির্মল গুহরায়। শেষ দৃশ্যের খনিগর্ভের এই ভয়াবহ, মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে নির্মল গুহরায় আশ্চর্য ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তার একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সফল হয়েছিল তা শেষ দৃশ্যের বাতাবরণ দেখলেই সহজেই বোধগম্য হয়। শেষ দৃশ্যের এই ভয়াবহ ও মায়াময় দৃশ্যসজ্জার জন্যে নাটকটি আরও প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে উঠেছে।

নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের সঙ্গে পণ্ডিত রবিশংকর-এর সৃষ্ট আবহ সংগীত যুক্ত হয়েছে, এর সঙ্গে নানা এফেক্ট মিউজিকও যুক্ত হয়েছে। এই আবহসংগীত ও এফেক্ট মিউজিক নাটকের অনুভবকে আরও গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। কোন কোন দৃশ্যে এই আবহসংগীত ও এফেক্ট মিউজিক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যা দর্শককে এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হতে দেয় না। বিশেষ করে, নাটকের শেষ দৃশ্যে যে খনির ভিতরকার আটকে পড়া শ্রমিকদের কাতর আর্তনাদের সঙ্গে মিউজিকের সংযোগ ও আবহসংগীত অসামান্য মাত্রার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দর্শকদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন এই নাটক দেখতে দেখতে এই শ্বাসরোধকারী দমবন্ধকর দৃশ্যের উপস্থাপনার ও এফেক্ট মিউজিকের প্রভাবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে এমন খবরও পাওয়া যেত নাটক শেষ হলে দর্শকদের আসন ছেড়ে উঠতে সময় লাগতো, কারণ নাটকের এই ভয়াবহতার ঘোর কাটতে বেশ কিছুটা সময় যেত।

‘অঙ্গার’ নাটকই প্রথম শ্রমিকশ্রেণিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলা নাটক। ‘অঙ্গার’ নাটকে শ্রমিকশ্রেণিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ও শ্রমিকশ্রেণির হাসি-কান্না-বেদনা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা নাটকে ইতিপূর্বে শ্রমিকশ্রেণি পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে থাকত, কিন্তু আলোচ্য নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র। কোম্পানির শোষণ-বঞ্চনা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির যে আন্দোলন তার বিদ্রোহ প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যায়-শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদের আন্দোলনে শামিল হয়েছে তাদের মধ্যে সংগ্রামের আভাস পরিলক্ষিত ও সেই প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় শ্রমিক কুদরৎ। নাট্যকার উৎপল দত্ত শ্রেণিসংগ্রামের এক আভাসকে ফুটিয়ে তোলেন ‘অঙ্গার’ নাটকে। নাট্যকার নিঃসন্দেহে শ্রমিকশ্রেণির পক্ষ নিয়ে পুঁজিবাদী শোষক এবং নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্যকে

চড়া সুরে বেঁধেছেন। অনেকের কাছে মনে হতে পারে নাটকের প্রচার মূল্য ও শিল্পমূল্যকে নষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে উৎপল দত্ত ছিলেন আপাদমস্তক 'প্রোপাগান্ডিস্ট', বামপন্থার প্রচারক। তাই তাঁর শিল্পকর্মে বামপন্থী আদর্শ, আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারা থাকবে এতে আর আশ্চর্য কী! মালিকশ্রেণির অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন-বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে দেখে দর্শককে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। 'অঙ্গার' নাটক গণমানুষের ওপরে সে সময় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তা একটি ঘটনা থেকেই সহজেই অনুমেয়। মিনার্ভায় 'অঙ্গার' অভিনয়ের সময়ে তৎকালীন কংগ্রেসি নেতা নেপাল রায় তার দলবল নিয়ে এসেও অভিনয় বন্ধ করার ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকেন এবং কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা দাহন করেন। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন উৎপল দত্ত—

> *Then came the attack on our theatre. The play 'Coal' [অঙ্গার] had already run 1100 performances and that evening's house had been out well in advance. Almost next to our theatre [Minerva] is a park called the Beadon square and there from about three in the after-noon, the congress boss of the area, Nepal Ray, began haranguing his elite guard— gangsters, thieves, pickpocketets and general dropouts, At about six in the evening they burnt an effigy of Jyoti Basu there and Nepal Ray seized the microphone once more and yelled : It is our shame that a play like Angar in still running inside our area।* [২৯]

'অঙ্গার' নাটকে নাট্যকারের আদর্শ ও ভাবধারার কিছু প্রচার উদ্দেশ্য থাকলেও নাটকের বিষয়বস্তু তার উপস্থাপনা দর্শকদের মনে প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অসামান্য অভিনয় সকলের নজর কেড়েছিল, মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছিল। স্টেজ কম্পোজিশান তো লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল, নির্মল গুহরায়ের মঞ্চসজ্জার একটি বাস্তব কয়লাখনি সমস্ত স্টেজ জুড়ে অবস্থান করেছিল। সেখানে দেখানো হয়েছিল খনি, খনিমুখ, ক্রেন, ডুলি, ট্রলি, খনিগর্ভ এবং তার মধ্যে কালো কালো কিছু শ্রমিক জীবন। তখনকার 'দেশ' পত্রিকায় মঞ্চসজ্জার বিবরণ দিয়ে লেখা হয়েছিল—

> *কোলিয়ারির যাবতীয় সরঞ্জাম ও কয়লাখনির গঠনরীতি আলো-আঁধারের মায়ার মধ্য দিয়ে এমন প্রামাণ্য রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা এদেশের রঙ্গমঞ্চে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে অন্ধকূপের মতো খাদের একটি অংশ ও তার ভেতরে বাঁধের জলের প্লাবনের দৃশ্য এক অত্যাশ্চর্য মঞ্চমায়ার পরিচয় দেয়।* [৩০]

থিয়েটার প্রযোজনায় 'অঙ্গার' নাটকের উপস্থাপনা, বিষয়, রি-কম্পোজিশান, কোরিয়গ্রাফি, আলো, শব্দ, আবহসংগীত সব মিলেমিশে নাটকটি বাংলা থিয়েটারের নাট্য অভিনয়ের ইতিহাসে এক অনন্য নজির হয়ে রইল।

'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) নাটক রচনায় উৎপল দত্ত আরেকটা নতুন বিষয় গ্রহণ করলেন। ১৯৩০-এর দশকের বাংলা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে নাটকটি রচিত। উনিশ শতকে ত্রিশের দশকে পূর্ব বাংলায় জেগে ওঠা যুবকদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঘটনা নিয়েই নাটকটি গড়ে উঠেছে। উৎপল দত্তের বহু পূর্বে অভিনীত ও প্রযোজিত 'Till the day I die' নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে, যদিও ঘটনা, চরিত্র, বিষয় বিন্যাস উৎপল দত্তের নিজস্ব সৃষ্টি। এই নাটকের দৃশ্যের শুরুতে প্রথমেই রয়েছে মঞ্চসজ্জার দীর্ঘ বর্ণনা। গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করেন বিবেক। গানের মাঝে থেমে সূর্য সেনের মুক্তি পথের নিশানায় মিলিত হওয়ার ও অর্থসাহায্যের আহ্বান জানিয়ে আবার গান ধরেন বিবেক। এরপর দেখা যায় পুলিশ অফিসার হিতেন দাশগুপ্ত বিবেককে ধরে নিয়ে যায়। প্রথমেই দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে দর্শককে তাক লাগিয়ে দেন। এমনি দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে উৎপল দত্ত প্রোসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। ভুবনডাঙা গির্জা ময়দানে হ্যাজাক বাতির নীলাভ আভায় যাত্রা হচ্ছে। কিছুটা দূরেই গির্জার দরজা। বৃদ্ধরা বসেছেন রোয়াকের ওপরে জমিদার বাবুর আশেপাশে। ছেলে-বুড়ো কৃষকের দল বসেছে মাটির ওপর। পালা জমে উঠেছে, গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে দীর্ঘকায় পুরুষ পাগড়ি পরা, সে দেশমাতৃকার বন্দনা করছে। যা শুনে দর্শকের চোখে জল চলে আসে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই অপূর্ব মঞ্চসজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই যাত্রার একটা পরিবেশে নাটকটি শুরু হয়, যে পরিবেশে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্ত বাংলার দর্শক, সেই চির চেনা যাত্রার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে একটা সাধারণ ও অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্য দিয়েই উৎপল দত্ত বিবেক তথা সূত্রধরের আগমনের মধ্যে দিয়ে নাট্য ঘটনায় প্রবেশ করান নাটকের কুশীলবদের। দর্শকও একাত্ম হয়ে যায় নাট্য মুহূর্তের সঙ্গে। এখানেই উৎপল দত্তের বিশেষ মুন্সিয়ানা।

'ফেরারী ফৌজ' নাটক মিনার্ভায় অভিনয়ের সময় যে মঞ্চ পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা নানান দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলো, শব্দ, দৃশ্যপট মিলেমিশে একাকার হয়ে সমগ্র নাট্য উপস্থাপনায় একটা অসাধারণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে দৃশ্যসজ্জাকে বাস্তবানুগ করার চেয়ে নাটকের গতিকে প্রবহমান রাখার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছিল। মঞ্চসজ্জার ওপরে বিশেষ চিন্তাভাবনা করে মঞ্চকে ত্রিস্তর করে নেওয়া হয়েছিল যাতে একই সঙ্গে একাধিক দৃশ্য অভিনয় করা যায়। তিনটি স্তরের মধ্যে নিম্নস্তরে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত জীবন, দ্বিতীয়

স্তর বা মধ্য স্তরে বিপ্লবীদের সংগ্রাম, তৃতীয় স্তরে পুলিশ, জমিদার তথা সমাজের উচ্চ শ্রেণি। এই তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পরিলক্ষিত হয় মঞ্চে। এই ত্রিস্তরিক দৃশ্যপটে অনেকসময় একই সঙ্গে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য অভিনীত হয়েছে। সবটাই ঘটেছে অনবদ্য আলোক নিয়ন্ত্রণ কৌশলে ও অনবদ্য উপস্থাপনায়। সেই সময়কার 'স্ক্রীন' পত্রিকায় 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে ত্রিস্তরীয় মঞ্চের বর্ণনা ও অভিনয়ের অভিনবত্বের প্রশংসা পাওয়া যায়—

> *এই দৃশ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত পর্যায়ের মানুষদের প্রথম স্তরে, বিপ্লবীদের আড্ডাকে দ্বিতীয় স্তরে এবং সর্বোচ্চ স্তরে প্রথমে জমিদার গৃহিণী এবং পরে চণ্ডশক্তির প্রতীক পুলিশ বাহিনীকে আবির্ভূত হতে দেখিয়েছেন উৎপল।* [৩১]

মঞ্চের পিছনে ন'ফুট উঁচু বেদি তৈরি করা হয়েছিল যা ব্যবহৃত হয়েছে গির্জায় যাওয়ার পথ হিসেবে আবার কখনও ভুবনডাঙার গ্রামের পারাপারের সাঁকো হিসেবে। মঞ্চের ডান দিকের মেঝেকে ব্যবহার করা হয়েছে বিপ্লবী অশোকের বাড়ির ভিতরের অংশ হিসেবে, আর মঞ্চের বাঁদিকের অংশে ছিল বার বণিতা রাধার ঘর ও গ্রামের হাটতলা। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন নির্মল গুহ রায়, আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। মঞ্চের এই নির্মাণ কৌশল ও প্রক্রিয়াকে উৎপল দত্ত স্বাগত জানিয়েছিলেন—

> *মঞ্চকে বহুস্তরে সাজিয়ে আমরা যবনিকার ব্যবহার কার্যত বর্জন করেছিলাম।* [৩২]

মঞ্চকে বহুস্তরে সজ্জিত করে তাপস সেনের অনবদ্য আলোক কলাকৌশলে অনবদ্য হয়ে উঠেছিল। আলোকের কলাকৌশল নাটকের নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করেছে তেমনি নাটকের গতিতেও প্রাণ সঞ্চার করেছে। নির্মল গুহরায়ের মঞ্চসজ্জা, তাপস সেনের আলোকসম্পাতের সঙ্গে মিশেছিল আবহসংগীত। পণ্ডিত রবি শংকরের নিপুণ আবহসংগীত সৃষ্টি 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে মাতাপুত্রের সাক্ষাৎকারের সময় যখন অশোক লুকিয়ে বাড়িতে এসেছে জানতে পেরে মাতা বঙ্গবাসী ল্যাম্প নিয়ে তাকে দেখতে আসে এবং অশোককে জড়িয়ে ধরে ও ল্যাম্পটা তুলে সন্তানের মুখ দেখার চেষ্টা করে, তখন যে মর্মস্পর্শী আবহসংগীত ধ্বনিত হয় তা নাটকের বিষয়ভাবনাকে অন্য পর্যায়ে, অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। আবার নাটকের সপ্তম দৃশ্যের একেবারে শেষে জনস্‌ন সাহেবকে মারতে গিয়ে বিপ্লবীরা ভুলবশত ফাদার ফ্লানাগানকে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুর সময় গির্জায় যে সংগীত ধ্বনিত হয় সে সংগীতের সুর বড়ো মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে পণ্ডিত রবিশংকরের দক্ষতায়। আবার নাটকের একেবারে শেষ লগ্নে যখন বিপ্লবীরা মুক্তির লড়াইয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে, সেই সময়কার

সংগীতের মূর্ছনা নাট্যভাবনাকে এক উচ্চতম ও বিশেষ পর্যায়ে তুলে নিয়ে যায়।

নাটকের দৃশ্য আলো, সংগীত, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির পাশাপাশি 'লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ'-এর কলাকুশলীদের অনবদ্য অভিনয় যুক্ত হয়েছিল। অশোকের চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আদর্শ সাচ্চা বিপ্লবী হিসেবে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। বিপ্লবীর আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠাবান, তা নির্ভীক মনে প্রকাশ অসাধারণভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার অশোকের মধ্যে শত অত্যাচারের পরেও তার দ্বন্দ্ব সংশয় অত্যাচার সহ্য করার বা সহ্যশক্তি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার পরে তার মানসিক যন্ত্রণা ও গুমরে ওঠা বেদনাকেও অভিনয় কৌশলের মধ্যে দিয়েও মূর্ত করে তুলেছেন—

অশোক : শান্তি রায় তাঁর দলকে রক্ষা করছেন, বিপ্লবকে রক্ষা করছেন, দেশকে রক্ষা করছেন। তিনি মহান, তিনি বিরাট, আক্রমণের সম্ভাবনাতেই তাঁকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। অশোক চাটুয্যে সেই বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে সামান্য একটা বিন্দু মাত্র, একটা জ্যামিতিক বিন্দু। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি একটা পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ মানুষ তোমাদের গায়ের রক্তে মাংসে আমার দেহ গড়ে উঠেছে। শান্তি রায়ের পক্ষে যে মানুষটাকে বোঝা অসম্ভব, তোমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না?

[এবার বাবা মা কেউই কোন জবাব দিতে পারেন না]

আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মনে ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারি না। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসঙ্গ, একা। দিন হলেই এইসব কাপড় জামা পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই যেখানেই যাই, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে, কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন। বন্ধুর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শত্রুর কারাগার। [৩৩]

অশোক কখনও সমিতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বা বিপ্লবীদের সঙ্গে কখনও ছলনার আশ্রয় নেননি। শত অত্যাচারে পুলিশ যখন তার বজ্র কঠিন প্রতিজ্ঞা থেকে একটি কথাও বার করতে পারেনি, তখন তাকে সুকৌশলে বিশ্বাসঘাতক সাজায়। যাতে বিপ্লবীরা মনে করে অশোক একজন

বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে আর তাতেই অশোক আত্মগ্লানিতে ভুগবে দ্বন্দ্ব সংশয়ে নিজের অন্তরকে জর্জরিত করবে। বিপ্লবী দলের প্রতি আপাদমস্তক বিশ্বাসী অশোক শত অত্যাচারেও একটি কথা মুখ থেকে বার করেন না, তাকে ক্রমাগত অত্যাচারে দিশেহারা করে তোলে, পাছে মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরিয়ে যায় তাই সে আত্মহত্যা পর্যন্তও করতে মনস্থির করে—

অশোক : মা, সেই রিভলভারটা চাই... নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। ক্রমশ মাথার মধ্যে পারম্পর্যের খেই হারিয়ে যাচ্ছে, আমি বোধ হয় ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছি। আজকাল তাই প্রাণপণে চেষ্টা করি না ঘুমোতে— দাঁড়িয়ে থাকি, ছুটে বেড়াই সেল্-এর মধ্যে, দেয়ালে মাথা ঠুকি যাতে ঘুম না আসে। কিন্তু দু রাত তিন রাত পর ঘুম আসে। কখন যেন মাটিতে পড়ে যাই। যখন ঘুম ভাঙে, দেখি শকুনের মতন আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে সাব ইন্‌স্‌পেক্টর প্রকাশ মুখুটি। তাই আর তো ঝুঁকি নেয়া চলে না। কি বলে ফেলব কে জানে? কি বলে ফেলেছি তাই বা কে জানে? [৩৪]

পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্তের অভিনয় অনবদ্য ছিল। ইংরেজ শাসকের আজ্ঞাবাহী হিসেবে তার নির্মম অত্যাচারী রূপ, বিপ্লবীদের ওপরে তার অত্যাচারের ধরন, তার কুটিলতা প্রভৃতি তার আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় নিপুণ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিপ্লবী অশোক পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় যখন সে কোনো কিছুই জানাতে চায় না তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্তের যে অত্যাচার ও নির্মমতার ছবি দর্শককে আলোড়িত করে তোলে। অশোককে প্রচণ্ড প্রহার, অকথ্য অত্যাচার করার পরে হিতেন দাশগুপ্ত বলেন—

অশোকবাবু! সবে শুরু হয়েছে, বুঝছেন? ভাঙতে পারিনি এমন লোক এখনো দেখিনি। মানসিক চাপ শুরু হবে, সইতে পারবেন? এটুকু বুঝলাম— আপনার শরীর শক্ত। কিন্তু এরপর যা আরম্ভ হবে, পাগল হয়ে যাবেন, চুল ক'টা সাদা হয়ে যাবে। বলে ফেলুন। [৩৫]

আবার ব্রিটিশ পুলিশের বড়ো কর্তা জনসন সাহেবের নির্দেশে হিতেন দাশগুপ্ত বিপ্লবী অশোক চাটুজ্জ্যের স্ত্রী ও কন্যার ওপরে অমানসিক ও পাশবিক অত্যাচার করতে পিছুপা হন না। সেই অত্যাচারের নির্দেশ আসে পুলিশ কর্তা জনসন সাহেবের কাছ থেকে—

জনসন : We want results, Dasgupta, results. He has a daughter, hasn't he? And a wife?

হিতেন : Yes, Sir.

জনসন : Well, why not use them?

হিতেন : I have already sent for the wife, Sir.[৩৬]

নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে বারবণিতা রাধারানীর ঘরে হিতেনের ঘরে চারদিকে সজাগ ও পুলিশি অনুসন্ধানী দৃষ্টি, দর্শকের নজর এড়ায় না। তার চালচলন কথাবার্তা ঘরের প্রতিটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারেরই পরিচয় বাহক। রাধারানীর সঙ্গে কথোপকথন কালে এক অত্যাচারী পুলিশ অফিসারের স্বরূপটি ফুটে ওঠে—

> *আমায় সব বলে ফেললে কেন রাধা? ভয়? আমাকে ভয় করে না? সবাই ভয় করে আমাকে। এটাই হল আমার ট্র্যাজেডি আমার স্ত্রী— দেবযানীর মা! সেও আমাকে ভয় করে। আর আমার হয়ে যায় রাগ। মারি, তবু সে আমাকে ভালোবাসে না। মেয়ের গা পুড়িয়ে দিই তার মাকে ব্যথা দেয়ার জন্যে। পরে নিজেরই এমন কান্না পায়। আসলে কি জানো? ওরা সবাই আমাকে ঘৃণা করে।* [৩৭]

উৎপল দত্ত নীলমণি এবং শান্তি রায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। তার একাধারে দেখতে পাওয়া যায় তিনটি রূপকে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে— নীলমণি, ছদ্মবেশী শান্তি রায় এবং বিপ্লবীর নেতা একাকার হয়ে যায়। নাটকের প্রারম্ভে নীলমণি চরিত্রটিকে দেখলে আপাতভাবে মনে হবে যিনি একজন ইংরেজ শাসকও পুলিশের মদতকারী গুপ্তচর, যে বাংলার বিপ্লবীদের বিভিন্ন প্রান্তের খবরাখবর পুলিশের কাছে সরবরাহ করে পুলিশকে সহযোগিতা করতে চান ও বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বিদ্রোহকে দমন করতে সদা তৎপর। ইংরেজদের সহায়তাকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্তকে নীলমণি সম্পর্কে বলতে শোনা যায়— "He is a friend don't beat him"[৩৮] তাই নীলমণির কার্যকলাপ, কথাবার্তা কেমন যেন সব সন্দেহজনক। তাই নীলমণি যখন বিপ্লবী অশোক চাটুজ্জ্যের বাড়িতে আসে তখন অশোক চাটুজ্জ্যের পিতা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নীলমণি সম্পর্কে বলে থাকেন—

> *নিশ্চয়ই নীলমণি। গুপ্তচর। রোজ সন্ধ্যেবেলা হানা দিচ্ছে। খুব সাবধান একটা বেফাঁস কথা—।* [৩৯]

আবার অশোকের মাতা বঙ্গবাসীকেও নীলমণি সম্পর্কে বলতে শোনা যায়—

> *টাকা সব পারে। অভাবে সব করে। আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছেন আপনি। এরপর একদিন বলবেন— অশোককে ছেড়ে দেবেন কিন্তু শান্তি রায়কে ধরিয়ে দিতে হবে। ততক্ষণে আমরা কেনা গোলাম হয়ে গেছি— তাই হয়তো করে বসব।* [৪০]

নাটকের অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায় এই নীলমণিই হলেন আসলে শান্তি রায়, যিনি বিপ্লবী

দলের নেতা, সমিতির সর্বেসর্বা। যিনি গোপনে সমিতির কার্যকলাপ, দলের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ, নিয়ম প্রদান করেন আড়ালে থেকে দলের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ করেন ও দলকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন, বিপ্লবকেও। অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায় বারাঙ্গনা রাধারানীর ঘরে দলের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তি রায় দলকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। জনসন সাহেব কোন দিন, কবে, কোথা থেকে ঢাকা যাবেন সে সংবাদ পরিবেশন করেন শান্তি রায়। জনসন সাহেবকে স্টিমার কোম্পানির তেলের গুদামে কীভাবে তাকে হত্যা করতে হবে বিপ্লবী দলকে তার প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কৌশল বাতলে দেন শান্তি রায়। এই গোপন শলা পরামর্শের মাঝে যখন পুলিশ এসে উপস্থিত হয়, তখন দেখি সঙ্গে সঙ্গে শান্তি রায় চোখে চশমা এঁটে নীলমণি হয়ে গেছেন। পুলিশের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করার অভিনয়ও সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেন—

> *নীলমণি : কাল থেকে নজর রেখেছি, কই তেমন কিছু তো। অ-সম্ভব। অশোক ভুল খবর দিয়েছে।... অশোক। হয়রানি করাচ্ছো কেন বাপু? পালের গোদাটাকে হ্যান্ডওভার করো না বাপু।* [৪১]

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় শান্তি রায় ও বিপ্লবীদের নেতা একাকার হয়ে গিয়েছেন। জনসন সাহেবকে হত্যা করতে না পেরে, কুমুদের বিশ্বাসঘাতকতায় যখন সমস্ত বিপ্লবীদলকে স্ট্রীমার ঘাটে পুলিশ ঘিরে ফেলে তখন শান্তি রায় বিপ্লবীদলকে পরামর্শ দিতে থাকেন কীভাবে এই পুলিশের ঘেরাটোপ থেকে পালাতে হবে। কিন্তু দেখেন যে পুলিশের নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপ থেকে বেরোনো অসম্ভব তখন শান্তি রায় বিপ্লবীদলকে লড়াই করার পরামর্শ দেন—

> *না, শির ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিল মে। শেষ লড়াইয়ের মুহূর্ত এসে গেছে ভাই। সবাই একসঙ্গে গুলি করতে করতে বেরুবো। হাতে হাত দেবে— তোদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে ধন্য হয়েছি।* [৪২]

উৎপল দত্তের এই ত্রিস্তরীয় অভিনয় দর্শকের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত। নীলমণি থেকে ছদ্মবেশী শান্তি রায় আবার পুলিশের সামনে ছদ্মবেশী শান্তি রায় থেকে নীলমণিতে পরিণত হওয়া ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক অভিনয়, দর্শককে মুগ্ধ করে। সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকা এই চরিত্রটির সৃষ্টি ও রূপায়ণের প্রশংসা করে লিখেছিল—

> *উৎপল দত্ত প্রথমে তার অভিনয়ে চরিত্রের ছদ্ম পরিচয়ের প্রতি সুবিচার করেন এবং সেইসঙ্গে দর্শকের চিত্তে আশানুরূপভাবে সঞ্চার করেন।* [৪৩]

অভিনেতার পাশাপাশি অভিনেত্রীদের মধ্যে অশোকের মা বঙ্গবাসী দেবীর চরিত্রে অভিনয়

করেছিলেন শোভা সেন। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় বিপ্লবী অশোক চাটুজ্যে যখন লুকিয়ে বাড়িতে আসে তখন অশোকের মা বঙ্গবাসী দেবী তাকে অনেক যত্ন-স্নেহ করেন। শীর্ণ-ক্লান্ত অশোককে পায়েসের বাটি এগিয়ে দেন এবং খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আবার নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় যখন পুলিশ অশোকের মুখ থেকে কোনো কথা বার করতে না পেরে অশোককে পরিকল্পনা মাফিক বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করে এই খবর যখন অশোকের মা জানতে পারে, তিনি প্রচণ্ডভাবে আহত হন। যখন পুলিশ পরিকল্পনা করে রটিয়ে দেন যে অশোক বিশ্বাসঘাতকতা করে সমিতির কার্যকলাপ ও তাদের নেতা শান্তি রায় সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পুলিশের কাছে বলে দিয়েছে তখন শুনে তার মা বঙ্গবাসী দেবী প্রচণ্ডভাবেই মর্মাহত হন। তাই যোগেনবাবু যখন অশোকের নাম উচ্চারণ করেন তখন বঙ্গবাসী দেবী বজ্রকঠিন ভাষায় পুত্র স্নেহকে দূরে সরিয়ে রেখে বলে ওঠেন—

বঙ্গবাসী : এ বাড়িতে ঐ নাম করা বারণ—! আমাদের ছেলে ছিল একটা। গত মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়েছে। লেখো শচী, বইটা শেষ করতে হবে।

যোগেন : শচীর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তারপরও কি করে লিখবে, কি করে দৈনন্দিনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবে?

বঙ্গবাসী : খাওয়াতেই হবে। এ বাড়ির কাজকর্ম আচার-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি চলবে না। যে মরে গেছে তার জন্য ভেবে ভেবে আমাদের দিন কাটবে না।

শচী : কিন্তু গোপা? ওর বাবা মরে গেছে একথা ওকে কে বলবে?

বঙ্গবাসী : অনেকেরই বাবা মরে যায়। সেটা জগতের নিয়ম। তুই না বলতে পারিস, আমি বলব। [৪৪]

আবার দেখা যায় অশোক যখন বাড়িতে দেখা করতে আসে তখন তার মা বলে ওঠে—

মা : কে অশোক? অশোক নামে কাউকে চিনি না, চিনতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। কি প্রয়োজন এখানে?... তোমারই নেতা শান্তি রায়ের আদেশ আছে তোমাকে এখানে জলস্পর্শ পর্যন্ত করতে দেয়া চলবে না। তুমি চলে যাও এখান থেকে। [৪৫]

অশোককে তার মাতা বঙ্গবাসী দেবী প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে কিন্তু পুলিশের পরিকল্পনায় অশোকের বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাওয়া— এই সংবাদ তাকে এতটাই আঘাত করে যে তিনি অশোককে ঘৃণা করতে শুরু করেন। অশোকের মা সন্তান অশোককে ভালোবাসে বললে ভুল হবে,

ভালোবাসে বিপ্লবী অশোককে যে অনুশীলন সমিতির সদস্য, তাই তার মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে এতটাই মর্মাহত হয়ে পড়েন যে তার মুখ পর্যন্ত দেখতে চান না।

অশোকের স্ত্রী শচীর চরিত্রে অভিনয় করেন তপতী ঘোষ। তাঁর মর্মস্পর্শী, হৃদয় বিদারক অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। শচী একজন বিপ্লবীর স্ত্রী। তাই সে কমবেশি বিপ্লবী ভাবধারায় ও আদর্শে বিশ্বাসী। শত প্রচেষ্টা, শত অত্যাচার করার পরেও যখন বিপ্লবী অশোকের মুখ দিয়ে একটি কথা বের হয় না, তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত অশোকের স্ত্রী শচী ও তার কন্যা গোপাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে তবুও বিপ্লবী অশোকের স্ত্রী শচীদেবীকে টলাতে পারে না বা বিগলিত করতে পারে না। বরং সে আরও দৃঢ় ও প্রত্যয়ের সঙ্গে অশোককে বলে—

> *একটা কথাও বোলো না। এদের একটা কথাও বোলো না। মেয়ে আমার, অশোক চাটুয্যের সন্তান। তার একটুও লাগাবে না। একটি কথাও বোলো না এদের।* [৪৬]

পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত শচীদেবীকে ইজ্জত লুণ্ঠনের ভয় দেখালে শচীদেবী দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয়—

> *স্বামীকে মেরে ফেলেছেন আপনারা, আর ইজ্জতের ভয়? এ আমি জানতাম না। এভাবে যে একটা উদারচেতা পুরুষকে আপনারা নির্যাতন করেছেন এ জানতাম না।* [৪৭]

বারবণিতা রাধারানীর চরিত্রে নিলীমা দাশের অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। বারবণিতার মৃত অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তির কামনার সঙ্গে সঙ্গে দেশমাত্রিকার বন্ধন মুক্তির স্বপ্নে বিভোর সে। দেশমাত্রিকার বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার সংগ্রামী কার্যকলাপ ও বিপ্লবীদের নিজের জীবন বাজি রেখে আপ্রাণ সহযোগিতা ও গভীর অনুভবের অভিনয় অসামান্য, অসাধারণ নজির সৃষ্টি করে। রাধারানী একজন বারবণিতা হলেও সে সুকৌশলে আশ্রয় প্রদান করে। শান্তি রায়ও রাধারানীর ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে শলাপরামর্শ করে ও বিভিন্ন পরিকল্পনা করে থাকেন। রাধারানী তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিপ্লবীদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন ব্রিটিশ পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি থেকে। পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত যখন বিপ্লবী দল সম্পর্কে সবই জানতে পারেন এবং বিপ্লবীদের সমূলে নাশ করার পরিকল্পনা করেন, তখন রাধারানী অন্য উপায়ান্ত না দেখে হিতেন দাশগুপ্তের সামনে বিপ্লবীদের সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য দিয়ে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়ার অভিনয় করেন। তার উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা হিতেনের কাছে বিপ্লবী দল ও শান্তি রায় সম্পর্কে সমস্ত কিছু ফাঁস করে দেয় ও হিতেন দাশগুপ্তকে নানান অছিলায় ভুলিয়ে মাদকের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে পান করিয়ে তাকে হত্যা করে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বারাঙ্গনা রাধারানীর এহেন অভিনয়

অনন্যতার ছাপ রাখে।

মার্কসবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত সুকৌশলে তাঁর মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা-আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করে থাকেন। আলোচ্য 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে উৎপল দত্ত সুকৌশলে শ্রেণিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, শ্রেণিসংগ্রামে সহযোগিতার বিষয়টি সুকৌশলে তুলে ধরেন। রাধারানীর মতো বারাঙ্গনা দেশের স্বার্থে, দেশের বিপ্লবীদের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে সেও শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামে শামিল হয়। বিপ্লবী জ্যোতির্ময় বারাঙ্গনা নারী রাধারানী সম্পর্কে বলেন—

> *তুমি আশ্চর্য মাইয়া। ইংলন্ডের নারীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট আর ভুবনডাঙার রাধারানী দেবী স্বাধীনতা যুদ্ধের ভ্যানগার্ড।* [৪৮]

স্বাধীনতা সংগ্রামে, শ্রেণিসংগ্রামে ইংল্যান্ডের রানীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট-এর সঙ্গে বাংলাদেশের ভুবনডাঙা গ্রামের রাধারানী দেবী এক হয়ে যায়। আবার হিতেন দাশগুপ্ত ও প্রকাশ মুকুটি-এর চরিত্রের মধ্য দিয়ে শ্রেণিশত্রু বিষয়টিও প্রস্ফুট করেন। থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত অশোকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের নীতি-আদর্শকেও তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেন। অশোক ও কুমুদের কথোপকথনে সে ভাবধারা স্পষ্ট—

অশোক : মাস্টারদা যেখান পারেননি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন? না, আমার মনে হয় শান্তি দাও পারেন না। কোনো লোক একা পারেন না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে। লেনিন বলেছেন—

কুমুদ : লেনিন বিদেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমরা সে পদ্ধতি নেব কেন?

অশোক : নেব, কারণ পরাধীনতা সব দেশেই এক— আফ্রিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে। বিদেশী বর্জনকে অমন ridiculous limits-এ নিয়ে যেও না, কুমুদ, যে পিস্তলটা ব্যবহার করছ সেটাও বিদেশে তৈরী। [৪৯]

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিপ্লবী আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী কিছু নেতাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা সর্বজনবিদিত। বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দেশকে বিকিয়ে দিতেও পিছুপা হয়নি। মার্কসবাদের 'প্রোপাগান্ডিস্ট' উৎপল দত্ত বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় ও স্বাধীনতা আন্দোলনে দক্ষিণপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা, বামপন্থীদের লড়াইয়ে এগিয়ে দিয়ে পিছন দিক দিয়ে কলকাঠি নেড়ে সেই আন্দোলনকে অবদমিত করার প্রচেষ্টা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের আমরণ সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের চিত্র তিনি সুকৌশলে অঙ্কন করেছেন—

যোগেন : কংগ্রেস-এর অহিংস সংগ্রামের রেজলিউশন পড়েছিস?

অশোক : হ্যাঁ।

যোগেন : কি মনে হয়?

অশোক : বিট্রেয়াল! বিশ্বাসঘাতকতা, আমাদের লড়াইয়ে ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে হঠাৎ— নন ভায়োলেন্স! দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতা দখল করেছে, বাবা। ওরা চায় আমরা ধরা পড়ি। কোনো কোনো জেলায় ওরা সরাসরি পুলিশকে সাহায্য করছে। [৫০]

নাট্যকার উৎপল দত্ত নাটকের নির্দেশকও পরিচালক। থিয়েটারকে সাফল্যে পৌঁছে দেওয়ার সব কৃতিত্ব তাঁর। তিনি তাঁর থিয়েটারকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সময়ে সৃষ্ট প্রতিভাগুলিকে সফলভাবে মঞ্চে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করেছেন। থিয়েটারকে দর্শকের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে মঞ্চ-আলো-সংগীত-অভিনয় সব দিকে সজাগভাবে দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য সফল ব্যক্তিদের দ্বারা কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করেছেন। তাই মঞ্চ-আলো-সংগীত-অভিনয় একাকার হয়ে গিয়েছিল এই নাটকে।

'কল্লোল' (১৯৬৫) উৎপল দত্তের নৌবিদ্রোহ কেন্দ্রিক অসামান্য ঐতিহাসিক প্রযোজনা। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ভারতের নৌ বিদ্রোহের ঘটনা বৃত্তান্ত 'কল্লোল' নাটকের মূল অবলম্বন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মির ভারতীয় নৌসেনারা মোট উনিশ বার বিদ্রোহ করে, যে বিদ্রোহের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা ইংরেজদের যেমন ভীত সন্ত্রস্ত করে তেমনি তাদের সন্ত্রাসী সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও ভয়াবহতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করতে তৎপর হয় ও দমন করে। ১৯৪৪-খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ নৌবিদ্রোহের পর পুনরায় নৌবিদ্রোহ সংগঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

'কল্লোল' নাটকের সময়কাল ১৯৪৬। পরাধীন ভারতবর্ষের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের ঠিক প্রাক্‌মুহূর্ত। এই সময় দেশের নানা প্রান্তে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা লাভের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এশিয়ার দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বন্যা দেখা দিয়েছে সর্বত্র। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজের 'দিল্লী চলো' অভিযান, বন্দিমুক্তি আন্দোলন, ছাত্র-

শ্রমিক-কৃষক ধর্মঘট সব মিলিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এক অগ্নিগর্ভ, অশান্ত, ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যাপক ও বিস্তার লাভ করতে সক্ষম। এই প্রেক্ষাপটেই তিনি 'কল্লোল' নাটকের অবতারণা ও প্রযোজনা করেন।

'কল্লোল' নাটকটি প্রযোজনার সময় মিনার্ভা থিয়েটারে যে মঞ্চ প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা এককথায় অসাধারণ ও বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। শব্দ, আলো, দৃশ্যপট এবং চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল নাট্য উপস্থাপনায় এবং এক অসাধারণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল যা দর্শককে চমকিত করে। মঞ্চ সজ্জার ওপরে বিশেষ দৃষ্টি ও যত্নবান ছিলেন। নাটকে তিনটি সেট ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি স্থানে নাটকের ঘটনা সংস্থাপন করা হয়েছে— 'খাইবার' জাহাজের বিশাল সেট, ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি সেট এবং ব্রিটিশ বাহিনীর নৌসেনার হেড কোয়ার্টার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রের ডাকবাংলো সেট। প্রথম সেটে ভারতীয় নৌ জাহাজ 'খাইবার'-এর নাবিকদের কাহিনি দেখানো হয়েছে। 'খাইবার' এখানে প্রতীকধর্মী, 'খাইবার' সব বিদ্রোহী জাহাজের প্রতিনিধি স্বরূপ। 'খাইবার' মঞ্চের মাঝখানে বিরাট জাহাজ যেন উপকূলে নোঙর করে আছে। এই জাহাজের সৈন্যরা সমুদ্র বক্ষে ইটালিয়ান নৌসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেকে আহত হন ও মারা যান, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারাই জয়ী হয়। কিন্তু 'খাইবার' জাহাজ ও তার নাবিকেরা যুদ্ধ শেষে নিখোঁজ হয়ে যায়।

আরেকটা সেট দেখা যায় ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি। সেখানে বেশিরভাগ নাবিকের আত্মীয় পরিজনেরা। তারা আশায় বুক বেঁধে থাকে নিখোঁজ নাবিকদের জন্য। 'খাইবার' জাহাজের গানার সার্দুল সিংয়ের জন্য তার স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ দিনাতিপাত করতে থাকে। দীর্ঘদিন স্বামীর অদর্শনে ও যোগাযোগহীনতায় তার মধ্যে গভীর বেদনা যেমন জাগ্রত হয় সেইসঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে অর্থাভাব ও অনটন। এহেন পরিস্থিতিতে তার মানসম্মান ও ইজ্জত বিপর্যস্ত হওয়ার মুখে। তাদের পরিবারের এই বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা সুভাষ দেশাই। তৃতীয় সেটে দেখা যায় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অফিসারদের হেড কোয়ার্টার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে-র বাংলো। সেখানে দেখা যায় যখন নৌবিদ্রোহীদের আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না, তাদেরকে পরাস্ত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তখন দেশীয় কিছু বিশ্বাসঘাতক নেতাদের সহায়তায় তাদেরকে বন্দি করার নির্লজ্জ কৌশল আশ্রয় করার কাহিনি। কংগ্রেস নেতা মগনলাল বাজুরিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে ও ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং নাবিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করে ও সমস্তরকম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে আলোচনা টেবিলেই নাবিকদের গ্রেপ্তার করা হয় ও সমস্ত আন্দোলন এক মুহূর্তে ভূ-লুণ্ঠিত হয়।

নাটকের মঞ্চের মাঝখানে দেখানো হয়েছিল সুবিশাল যুদ্ধ জাহাজ। কখনো দর্শকের দিকে

আড়াআড়ি, কখনো বা জাহাজটিকে সোজাসুজিভাবে। অভিনয় চলত কখনো জাহাজের নীচে, কখনো জাহাজের ডেকে, কখনো বা জাহাজের শীর্ষে। আবার জাহাজের নীচে গণগণে আগুনে ভরা বয়লার রুমে। একটা গোটা জাহাজ যেন তার সমস্তকিছু সরঞ্জাম সহযোগে জলে ভাসছে। নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন সুরেশ দত্ত। তার মঞ্চ নির্মাণের কৌশলে মনে হত এক সত্যিকারের জাহাজ উপকূলে নোঙর করে আছে। সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জায় দর্শকরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। আলোকসম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন। তাঁর আলোর কারিকরিতে দেখানো হয়েছিল জাহাজের পদপ্রান্তে সমুদ্রের জলের বিশাল ঢেউ আর সেই ঢেউয়ের টলমল জাহাজের দৃশ্য। জাহাজের ডেক আর মাস্তুল এবং গনগনে লাল আগুনে উদ্ভাসিত বয়লার রুম। যুদ্ধ চলাকালীন জাহাজের গায়ে এসে পড়ত যুদ্ধবিমানের ছায়া। আলোকের কায়দায় আবার দৃশ্যের চকিত পরিবর্তন হয়ে দেখা যেত শ্রমিকদের বস্তির অভ্যন্তর, আবার আলোকের কায়দায় পরের মুহূর্তে দৃশ্য পরিবর্তনে মঞ্চটি হয়ে উঠত ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের হেডকোয়ার্টার্স। সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জা ও তাপস সেনের আলোকসম্পাতের কারিকুরি দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আলোকসম্পাতে তাপস সেনের কারিকুরি ও সুরেশ দত্তের দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর 'লিট্‌ল্ থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> *বিদ্রোহের দৃশ্যে প্রথমে তেরঙ্গা ও লিগের ঝাণ্ডা ক্রুজার খাইবারের মাস্তুলে উঠে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তারপর ইন্টারন্যাশনাল গানের সঙ্গে লাল নিশান এসে, সদর্পে উড়তে লাগল আলোকবৃত্তের মধ্যস্থলে এবং ঘন ঘন স্লোগানে মুখরিত হতে লাগল প্রেক্ষাগৃহ। নেপথ্যে ক্লান্ত তাপস সেন হঠাৎ ঘুরে আমার হাত চেপে ধরলেন। লিট্‌ল্ থিয়েটারের বহু বছরের ত্যাগ ও শ্রম যেন ঐ মুহূর্তে কেন্দ্রবিন্দুতে এসে রোমাঞ্চিত সার্থকতায় পূর্ণ হল।* [৫১]

নাটকের শুরুতেই সূত্রধারের কণ্ঠে অহিংস আন্দোলনের অসাড়তা এবং সহিংস আন্দোলনের সার্থকতার তাৎপর্য খুঁজে পাই। তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সেই কালো যবনিকা উন্মোচন করেছেন যেখানে অহিংস আন্দোলনকারীদের হীন চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা কীভাবে সহিংস আন্দোলনকারীদের সমস্ত আন্দোলনকে পরিকল্পনা মাফিক ভেস্তে দিয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। নাটকের সূত্রধার ঘটনা পরম্পরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নাটকের মূল বক্তব্যও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। নাটকের গোটা পরিস্থিতি ও ঘটনা বুঝতে সূত্রধারের বর্ণনা দর্শককে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করে। নাটকের সঙ্গে দর্শকদের একাত্মতা ঘটিয়ে তুলতে সুত্রধারের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপল দত্ত সুকৌশলে সূত্রধারের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। সূত্রধার চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্যের পরিস্ফুটন এই পূরাতন ধারা উৎপল

দত্ত সুকৌশলে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ব্যবহার করেছেন সফলতার সঙ্গে। কংগ্রেসি শাসকদের বিকৃত ইতিহাস প্রচারের প্রচেষ্টা, নৌবিদ্রোহে তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও সহিংস আন্দোলনকারী নাবিকদের আন্দোলনের ইতিহাস উৎপল দত্ত সূত্রধারের কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলেছেন—

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথে।
স্বাধীনতা যেন শিশুর হাতের মোয়া
হরির লুঠের বাতাসা, কুড়িয়ে নিলেই হোলো।
বিপ্লব কি শীতের সকালে গলির মোড়ে
নবাগত মিঠে রোদের ফালি,
যার খুশি পোয়ালেই হোলো?...
আজ বলবো ঐ নৌবিদ্রোহের কাহিনী চুপি চুপি।
অহিংস ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে,
এই নিভৃত কক্ষে আপনাদের বলি—
কোত্থেকে এল এই স্বাধীনতা।
যতই সাবান দিয়ে কেচে
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলি,
আসলে ও-পতাকা রক্ত লাল,
বোম্বায়ের নাবিকদের, ক্রুদ্ধ ছোটলোকদের রক্তে।।"[৫২]

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সার্দুল সিং। সার্দুল সিং চরিত্র সৃষ্টিতে উৎপল দত্ত বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। 'খাইবার' জাহাজের গানার সার্দুল সিং। সাহসে, তেজে ও দীপ্তিতে ভরপুর এক অনবদ্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন তিনি। 'কল্লোল' নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় 'খাইবার' জাহাজের মধ্যে ব্রিটিশ অফিসাররা 'পিপিলস এজ' পত্রিকার একটি কপি পায়, যা ছিল তখন রাজদ্রোহমূলক। এই পত্রিকা কীভাবে জাহাজে এল তার কারণ অনুসন্ধান করতে ব্রিটিশ অফিসাররা 'খাইবার' জাহাজের নাবিকদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার শুরু করে ও একজনকে বন্দি করে। এহেন অত্যাচারের পরিস্থিতিতে সার্দুল সিংয়ের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং হাতে মেশিনগান তুলে নেয়। একজন ইংরেজ অফিসারকে জখম করে

ও বাকিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে তার প্রবল পরাক্রমে। ইংরেজ অফিসারদের সামনে সে অনমনীয় ও দুর্বার, চোখে চোখ রেখে সে লড়াই করতে জানে। ইংরেজ অফিসারদের প্রতি তাই তার সদম্ভ হুমকি—

সার্দুল ।। ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং। আপনাদের ঠিক পাঁচ মিনিট দেয়া হোলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অস্ত্রগুলো ডেকে রেখে হাত তুলে দাঁড়াবেন। নইলে মেশিনগান চালিয়ে আপনাদের তিন জনকেই শেষ করে দেব।

[নীরবতা। তারপরই রেটিং রা আওয়াজ তোলে সাম্রাজ্যশাহী হো বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।]

...আর্ম ।। গানার সার্দুল সিং। এ কি করলে? ভারতীয় নৌবাহিনীর নামে কলঙ্ক লেপন করলে? ডেনহাম, অস্ত্রাগারে যাওয়ার চেষ্টা করো। সার্দুল সিং, আমি হুকুম দিচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে টারেট থেকে নেমে এস।

[ডেনহাম দৌড় মারতেই সার্দুলের মেশিনগান গর্জে ওঠে, ডেনহাম ছিটকে পড়ে যান। জাহাজীরা আবার আওয়াজ তোলে।]

সার্দুল ।। ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং, অস্ত্র ফেলে দিন বলছি। নইলে দেখলেন তো, মেরে ফেলবো? [৫৩]

মার্কসবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী উৎপল দত্ত সার্দুল সিংয়ের সশস্ত্র প্রত্যাঘাত দ্বারা একজন ইংরেজ অফিসারকে জখম ও অন্যান্য অফিসারদের আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতে চেয়েছেন যে— অস্ত্র ছাড়া জয় সম্ভব নয়, সাম্রাজ্যবাদকে দমন করতে গেলে, সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি পেতে হলে, দেশকে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা প্রদান করতে হলে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া কোনো পথ নেই। অনুনয়-বিনয়, অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে থাকলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হাত থেকে কখনো স্বাধীনতা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রাম।

চতুর্থ দৃশ্যের শেষ দিকে দেখা যায় গোরা ফৌজ কাস্‌ল্ ব্যারাকস্ আক্রমণ করে নিরস্ত্র জাহাজীদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। নিরস্ত্র জাহাজীদের ওপরে অতর্কিত ও অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সার্দুল সিং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে গুলি চালায়। নিরস্ত্র জাহাজীদের গোরা সৈন্যদের বর্বরোচিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে গোরা সৈন্যদের পিছু হটতে বাধ্য করে—

খাইবার-এর কামান গর্জন করে ওঠে। এক মুহূর্ত নীরবতা— তারপর কাস্‌ল ব্যারাকস থেকে স্লোগান শোনা যায় খাইবার জাহাজ জিন্দাবাদ।

দুষমনের মেশিনগান পোষ্ট ধ্বসে গেছে। টারেট হুমায়ুন রেঞ্জ নাইন ফোর অট অট অট টু

গ্রীন স্যালভো। দুষমন পালাচ্ছে। টারেট ইনকিলাব টু ডিগ্রীজ আপ রেঞ্জ এইট অট অট অট স্যালভো। মারো কমরেড, জানিয়ে দাও খাইবার পৌঁছে গেছে। [৫৪]

সার্দুল সিংয়ের মধ্যে এই সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত সেই বার্তাটাই জনতার দরবারে পৌঁছাতে চেয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার ব্রতে অস্ত্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষেই তিনি সওয়াল করেছেন।

স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত সার্দুল সিং অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন। বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সে যেমন আপসহীন তেমনি দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকল্পে মৃত্যুবরণ করার মধ্যেও তার মধ্যে কোনো রফা কাজ করে না। আপসহীন, দৃঢ়, বলিষ্ঠ সম্মুখভাগের যোদ্ধা সার্দুল সিং উৎপল দত্তের সৃষ্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে হোক বা বাস্তবে প্রতিকূল পরিবেশ বিবেচনা করে দেখতে বললে আপসহীন সার্দুল সিংয়ের সোজাসাপটা উত্তর—

বিবেচনা? বিবেচনা তো শিখিনি। আর সবাই যে বয়সে বই পড়ে, হাসে, জগৎটাকে দেখে মুগ্ধ হয়, আমরা যে সে বয়সে শুধুই মানুষ মারা শিখেছি। আমরা দেখি শুধুই টার্গেট, রেঞ্জ ওয়ান সিবাস অট্ অট্ অট্ স্যালভো। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি চলে গেল সম্পূর্ণ অপরিচিত অসংখ্য লোককে হত্যা করতে করতে। আজ হঠাৎ কী বিবেচনা করবো? [৫৫]

উৎপল দত্ত সার্দুল সিংয়ের মা কৃষ্ণা বাঈয়ের চরিত্রটি সৃষ্টিতে অনন্য সাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। যে নারী বৈপ্লবিক চেতনা, বৈপ্লবিক শৌর্যে ও বিশ্বাসে ভরপুর। কৃষ্ণাবাঈয়ের চরিত্রে শোভা সেন অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণাবাঈ চরিত্রটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই মাতা হিসেবে একদিকে যেমন তার মধ্যে সন্তানের স্নেহ, মায়া মমতায় ভরপুর, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনতার প্রশ্নে, সংগ্রামের প্রশ্নে লড়াকু সৈনিকের মতো দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। স্নেহশীলা মাতা ও সংগ্রামী সৈনিক এই দুই সমন্বয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণাবাঈ চরিত্রটি। সার্দুল সিংয়ের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে মাতা কৃষ্ণাবাঈ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সার্দুল সিং একদিন ঘরে ফিরে আসবেই। তার মাতৃস্নেহের পাশাপাশি দেখি আগামী সংগ্রাম ও বিদ্রোহের প্রতি তিনি সচেতন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিদ্রোহীদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কৃষ্ণাবাঈ সযত্নে ও সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখেন, যাতে সেই অস্ত্রশস্ত্রের হদিস কাকপক্ষীও যেন না পায়। পঙ্গু জাহাজী সুভাষ দেশাই ও সার্দুলের মাতা কৃষ্ণাবাঈয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সার্দুলের মাতা কৃষ্ণাবাঈয়ের কাছে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র জমানোর প্রসঙ্গটি উন্মোচিত হয়—

সুভাষ ।। অস্ত্রশস্ত্রগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো তো?

কৃষ্ণা ।।   বলবো কেন?... লড়াই লাগলে তো জানতে পারবিই।

সুভাষ ।।   কত অস্ত্র জমেছে?

কৃষ্ণা।।   গোটা কুড়ি পিস্তল, চারটে বন্দুক, দু'হাজারের বেশী গুলি। [৫৬]

গোলাবারুদ ও বন্দুকের সন্ধান ইংরেজরা জানতে পারার পর কৃষ্ণাবাঈ তাঁর পুত্রবধূ লক্ষ্মীবাঈয়ের ওপর শত অত্যাচারের সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ কৃষ্ণাবাঈ কোনোভাবেই বন্দুক ও গোলাবারুদের সন্ধান দিতে নারাজ। শত অত্যাচার ও নির্যাতনের পরেও তাঁর সন্ধান জানাতে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয় ইংরেজদের হুমকি পর্যন্ত দিয়ে থাকেন যে ভবিষ্যতে এই বন্দুক ও গোলাবারুদ নিয়ে তিনি ও তার বস্তিবাসীরা বদলা নেবেন। স্বাধীনচেতা সংগ্রামী নারী কৃষ্ণাবাঈ ভীষণ আহত হন যখন জানতে পারেন ইংরেজদের চক্রান্তে পা দিয়ে সংগ্রামকে পিছনে ফেলে সার্দুল সিং উপযাচক হয়ে ধরা দেয়। সার্দুল সিংয়ের আত্মসমর্পণের ঘটনা বিদ্রোহী নারী কৃষ্ণাবাঈয়ের কাছে যেন এক চরম লজ্জার বিষয়। নাটকের দশম দৃশ্যে তার কথোপকথনেই তা স্পষ্ট—

কৃষ্ণা ।।   ঐ গর্দভ। বুদ্ধু। ঐ সার্দুল। যেচে গিয়ে ধরা দিল? কেন ধরা দিল?

নুরুদ্দিন ।। আর কি করবে কৃষ্ণাবাঈ? লড়াই তো শেষ।

কৃষ্ণা ।।   কখনো নয়। শুনুন মেজর সাহেব, সার্দুলকে মারবেন জানি, কিন্তু ঐ বন্দুকগুলো রইল, বদলা নেব।

নুরুদ্দিন ।। আর লড়ে কি হবে? তার ওপর তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই ওরা গিয়েছিল সিটিং-এ। নইলে তোমায় মারতো।

কৃষ্ণা ।।   (চিৎকার) সেটাই তো আমার লজ্জা। সার্দুল কখনো এত নীচে নামতে পারে ভাবিনি। ওকে এ শিক্ষা তো আমি দিইনি। মা বাবা বউ-এর সঙ্গে ছেলেখেলার চেয়ে ঢের ঢের বড় হল বিপ্লব, আজাদীর লড়াই— এ শিক্ষাই তো পেয়েছে সে। [৫৭]

প্রাক্তন জাহাজী পঙ্গু সুভাষ দেশাই চরিত্রটির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। শ্রেণি সংগ্রাম—এই মার্কসবাদী আদর্শকে উৎপল দত্ত সুকৌশলে সুভাষ দেশাই নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত করেছেন। 'ক্যাসল ব্যারাক'-এ বিপন্ন জাহাজীদের বাঁচাতে গিয়ে খাইবার জাহাজ বিপদে পড়েছিল। যখন খাইবার সংকীর্ণ প্রণালীর মধ্যে ঢোকে তখন গোরা ফৌজের পাঁচটি জাহাজ সেই

প্রণালীর মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে বহির্জগৎ থেকে খাইবার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দেয়। খাইবার জাহাজের নাবিকদের যখন জীবন বিপন্ন ও সংকটময় তখন তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসে পঙ্গু সুভাষ দেশাই। তার একটি হাত না থাকা সত্ত্বেও সে গোপনে সাঁতার কেটে আটকে পড়া জাহাজীদের খাবার পৌঁছে দেওয়ার সংকল্পে অটল। খাইবার জাহাজের নাবিকদের বিপদে সুভাষ দেশাই স্থির থাকতে পারেন না। শত বাধা ও প্রচণ্ড গুলি বর্ষণের মধ্যে সুভাষ দেশাইয়ের প্রত্যয়—

> *তার দায়িত্ব নেবেন আপনারা প্রত্যেকে। 'খাইবার' আমাদের জন্যেই লড়ছে। তাকে খাওয়ানোর দায়িত্বও আমাদের। প্রাণ দিয়েও।* [৫৮]

নাটকের বিষয় ও ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে সংগীত ও সুর সংযোজনা করেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। নাটকের বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এদেশের নানা সুর যেমন ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি বিদেশের নানা সংগীতের সুরের সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। এই দেশি ও বিদেশি সুরগুলি ভারতের নৌবিদ্রোহের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। 'কল্লোল' নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর 'লিট্‌ল্ থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> *হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহারাষ্ট্রের পোয়াড়া ও লাওনি সুরে পশ্চিম প্রান্তের মহান মেহনতি মানুষের অন্তরে কথাগুলি যেন সাজিয়ে দিলেন পুষ্পস্তবকের মতন। সুরেশ দত্ত সৃষ্টি করলেন খাইবার ক্রুজার ও বস্তির দৃশ্য, তাপস সেনের আলো। আর সংগীতে আমরা জর্মন, রুশ ও চীনা বিখ্যাত নৌ-বিদ্রোহের গান কয়েকটি ব্যবহার করেছিলাম। আর অবশ্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগীত।* [৫৯]

উৎপল দত্ত তাঁর 'কল্লোল' নাটকের দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলেননি। বাস্তব দৃশ্যসজ্জা বা বাস্তবোত্তর দৃশ্যসজ্জা তাঁর নাটকের প্রযোজনার প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এক এবং অন্যতম উদ্দেশ্য থিয়েটারের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌঁছানো, নাটকের বক্তব্যকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দিয়ে গণমানসে তার প্রভাব তৈরি করা। তাই শুধুমাত্র দৃশ্যসজ্জার জন্যই দৃশ্যসজ্জা নয়, সাধারণ মানুষের দরবারে পৌঁছতে প্রযোজনার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন তা তিনি অনুসরণ করেছেন। তাঁর নাটকের বিভিন্ন চরিত্র তাদের সপ্রতিভ অভিনয়, সময়োপযোগী বিভিন্ন পোশাক ও তাদের বিভিন্ন চলচলন, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তাদের মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা প্রভৃতি নানা চরিত্রের নানা বৈচিত্র্যের সুষম সমন্বয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সংগীত, আলোকসম্পাত, নেপথ্য ধ্বনি প্রভৃতির অনন্য ঐক্য গড়ে

উঠেছে ‘কল্লোল’-এর প্রযোজনায়। ‘কল্লোল’ চলাকালীন সেই সময়কার ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-য় নাটকটির প্রযোজনার বিশেষ প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল—

> *বিশেষ প্রশংসার যোগ্য অবশ্যই এর প্রযোজনার দিকটি। দৃশ্য, ধ্বনি এবং অভিনয়ের অসাধারণ টিমওয়ার্কের মাধ্যমে যেভাবে দর্শকদের একের পর এক উত্তেজক মুহূর্তের মুখোমুখি করে দেওয়া হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। দৃশ্য পরিবর্তনের কাজ অতি দ্রুত। জাহাজের দৃশ্যসজ্জা [একাধিক] অপূর্ব; প্রয়োজন মতো আলোছায়ার নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্বনিপ্রেক্ষপণের ফলে গোটা ব্যাপারটি মায়া সৃষ্টি করতে পেরেছে।* [৬০]

মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত নিজেই নাটক লিখেছেন, নাটকে নির্দেশনা করেছেন, অভিনয় করেছেন আবার পরিচালনাও করেছেন। তাঁর থিয়েটার সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর একান্ত নিজের এবং সে থিয়েটার অবশ্যই বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী থিয়েটার। তিনি তাঁর নাটকের বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণে যত্নবান ছিলেন। দৃশ্যসজ্জা, অভিনয়, আলোকসম্পাত, আবহ সংগীত— এ সবকিছুরই সমন্বয়কে উৎপল দত্ত নাটকের আঙ্গিক বলে মনে করতেন। সুনির্দিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় অর্থাৎ মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে সমস্ত আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন যাতে তাঁর সেই আদর্শের অর্থাৎ মার্কসবাদী আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। আর সেই আদর্শ প্রতিফলন করার উদ্দেশ্যে নাট্য আঙ্গিকের প্রত্যেকটা দিকের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মার্কসবাদী রাজনৈতিক নাটককার উৎপল দত্তের বিষয় আঙ্গিক নির্বাচনের এক এবং অন্যতম উদ্দেশ্য দর্শকের দরবারে পৌঁছানো ও থিয়েটারকে বৈপ্লবিক থিয়েটারে উন্নীত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। নাটকের মধ্যে দিয়ে সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছানোই ছিল তাঁর গন্তব্য। এই বিষয়ে কখনো তিনি আপস করেননি। আর দর্শকের কাছে পৌঁছানোর জন্যই তিনি সদা সচেতন। থিয়েটারে যে কৌশল সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছানো যাবে বলে তিনি মনে করেছেন ওই নাটকের জন্য তিনি সেই আঙ্গিক বা সেই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। দর্শকের দরবারে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে থিয়েটার নিয়ে তাঁর নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা, আলো-সংগীত, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, নেপথ্য ধ্বনি প্রভৃতি সব দিকেই তাঁর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি এবং তাঁর কালের সফল ব্যক্তিদের দ্বারা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিনি কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। মঞ্চ-আলো-সংগীত-অভিনয় প্রতিটি আঙ্গিক তাঁর প্রযোজনায় একাকার হয়ে ওঠে, যা একক অনন্য ও বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, 'আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার', কলকাতা, ২০০৫, পৃ ২৩

২. উৎপল দত্ত, 'সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', 'দেশ', ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৫

৩. সূত্র-১, পৃ ২৮

৪. উৎপল দত্ত, 'যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল' (সুরজিৎ ঘোষের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার), 'দেশ', কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১

৫. উৎপল দত্ত, 'সঙ্গীত ও অভিনয়', 'চায়ের ধোঁয়া', 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, সম্পা-শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৫, পৃ ১০৫

৬. উৎপল দত্ত, 'স্তানিস্লাভস্কির পথ', 'স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেখ্ট্', উৎপল দত্ত, 'সঙ্গীত ও অভিনয়', 'চায়ের ধোঁয়া', 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ ২৭৪

৭. উৎপল দত্ত, 'এপিকের সারকথা', 'স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেখ্ট্', পূর্বোক্ত, 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', পৃ ২৭৭

৮. তদেব, পৃ ২৭৭

৯. শোভা সেন, 'ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', সম্পা-নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ১৩৩

১০. সূত্র-৭, পৃ ২৮৩

১১. দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম সংস্করণ ১০ই অক্টোবর ২০০৭, পৃ ১৮২, ১৮৩

১২. তদেব, পৃ ১৮২

১৩. তদেব, পৃ ১৮২

১৪. Utpal Dutta, "Political Theatre", 'Forwards a Revolutionary Theatre', M. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd., 1995, P. 34

১৫. সূত্র-৭, পৃ ২৮৩

১৬. পবিত্র সরকার, ভূমিকা, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র-১ম খণ্ড, সম্পা- শোভা সেন, সৌভিক রায়চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩, পৃ ১১

১৭. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক থিয়েটার ও উৎপল দত্ত', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', পৃ ১৯৯

১৮. উৎপল দত্ত, 'থিয়েটারের ভাষা', 'চায়ের ধোঁয়া', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১১৪

১৯. তদেব, পৃ ১১৮

২০. উৎপল দত্ত, 'দৃশ্যসজ্জা', 'চায়ের ধোঁয়া', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৭৭

২১. উৎপল দত্ত, 'আঙ্গিক', 'চায়ের ধোঁয়া', পূর্বোক্ত উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, পৃ ৭৩

২২. সূত্র-২০, পৃ ৭৮, ৭৯

২৩. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল্ থিয়েটার ও আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', পৃ ৪৪৩, ৪৪৪

২৪. তদেব, পৃ ৪৪৩, ৪৪৪

২৫. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সম্পা- শোভা সেন, সৌভিক রায়চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩, পৃ ১১৫, ১১৬

২৬. তদেব, পৃ ১৩৯

২৭. তদেব, পৃ ১৪৩, ১৪৪

২৮. উৎপল দত্ত, 'অঙ্গারে আঙ্গিক', 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৮৬, ৩৮৭

২৯. সূত্র-১৪, পৃ ৪০, ৪১

৩০. সূত্র-১১, পৃ ৫২

৩১. তদেব, পৃ ৫৯

৩২. তদেব, পৃ ৫৯

৩৩. সূত্র-২৫, পৃ ২০৮

৩৪. তদেব, পৃ ২০৮, ২০৯

৩৫. তদেব, পৃ ১৮৬

৩৬. তদেব, পৃ ১৮৮

৩৭. তদেব, পৃ ২০১

৩৮. তদেব, পৃ ১৬২

৩৯. তদেব, পৃ ১৭৩

৪০. তদেব, পৃ ১৭৪

৪১. তদেব, পৃ ২২২

৪২. তদেব, পৃ ২২৭

৪৩. সূত্র-১১, পৃ ৬০

৪৪. সূত্র-২৫, পৃ ২০৫

৪৫. তদেব, পৃ ২০৬, ২০৭

৪৬. তদেব, পৃ ১৯০

৪৭. তদেব, পৃ ১৯০

৪৮. তদেব, পৃ ১৬৯

৪৯. তদেব, পৃ ১৬৫

৫০. তদেব, পৃ ১৭৭

৫১. সূত্র, পৃ ৪৬

৫২. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা : শোভা সেন ও সৌভিক রায়চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৫, পৃ ২৩৭, ২৩৮

৫৩. তদেব, পৃ ২৬০

৫৪. তদেব, পৃ ২৬৬

৫৫. তদেব, পৃ ২৫৫

৫৬. তদেব, পৃ ২৪৯

৫৭. তদেব, পৃ ৩০৭

৫৮. তদেব, পৃ ২৭১

৫৯. সূত্র-২৩, পৃ ৪৫৬

৬০. সূত্র-১১, পৃ ৯০